শ্র য় ণ

শ্রয়ণ সংস্থা গড়ে উঠেছিল ১৯৯৬ সালে। উদ্দেশ্য ছিল - ঐতিহ্য সম্বন্ধে, আধুনিকতার রূপবিরূপতা সম্পর্কে এবং এ দুয়ের ট্যানজেনশিয়াল বিচ্ছুরণক্ষম মানুষের উত্তরণ নিয়ে বাংলাভাষী পাঠককে কিছু জানানো, নিজেদের শেখানো অন্যদের জানানো। সেই মতে আমরা স্থির করি, অন্যান্য কাজের মধ্যে, একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা বার করব যাতে এই এই বিষয়ের পরীক্ষানিরীক্ষা ও ধারণার ওপর লেখা থাকবে। বার হতে থাকে অতঃপর 'শ্রয়ণস্থল' পত্রিকা - আর এন আই দপ্তর আমাদের ঐ নামে পত্রিকা প্রকাশ করার স্বীকৃতি দেয়। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ অবধি, চার বছর ধরে আমরা একটানা চার-গুণ-ছয় চব্বিশটি সংখ্যা বার করি। প্রতিটি ছিল কমবেশি তিন ফর্মা করে। চব্বিশটি সংখ্যা বার করার পর - ১৯৯৯ এর শেষে আমরা কিছুটা 'সময়' বার করার কথা ভাবি আবার ভাবনা-প্রকাশে যেন বাধা না পড়ে সেদিকটিও খেয়াল রাখার চেষ্টা করি। সময় বার করার কারণ কিছু না কিছু সামাজিক কর্মে আমাদের বন্ধুরা যুক্ত রয়েছেন, শ্রয়ণ তাদের সঙ্গে ভাবতে চায় তার 'হয়ে ওঠা' নিয়ে।

এই নিয়ে যখন নিজেদের 'হয়ে ওঠা'টি ভাবতে লাগলাম - সিদ্ধান্ত নিলাম - বছরে ছটি নয়, জোর দুটি সংখ্যা বার হবে। নদীর একই জলে তো একবারই পা দিই তাই যতটা সম্ভব শ্রদ্ধাশীল হয়ে গবেষণাধর্মী ও গভীর মূল্যবহ একেকটি সংখ্যা বার করতে ছ'মাস কম করে লেগে যাবে। সেই প্রত্যয়ে ২০০০ সাল থেকে ২০০২ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়ে যায় - প্রকাশ পায় 'বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ', 'নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক', 'বিশ্বায়ন - বিজ্ঞান ও কৌশল', 'স্বনির্ভরতা'। এভাবে, বছরের সবদিনই কাজ করছি অথচ সময় ঠিক বেরিয়ে আসছে, বন্ধুরা যে যে পরীক্ষায় রত তাতে নজর দেয়ায় ঘাটতি থাকছে না। অতঃপর, ২০০৩ সালে ফের 'হয়ে ওঠা' নিয়ে প্রশ্ন পরিপ্রশ্ন। বার হয় 'শ্রয়ণে রবীন্দ্রনাথ' ২০০৩এ এবং 'সহজ জীবনের পাঠ' ২০০৪এ। এই দু বছর দুটি সংখ্যা বার হয়। এবং এইই চলবে স্থির করি।

তখন দেখি, কিছু কাজ হয়ে গেছে যাদের আমরা ভাবার জন্য প্রয়োজনীয় (এসেনশিয়াল নাম্বার) বলতে পারি(যেমন, ঐতিহ্য-আধুনিকতা, বৈষম্য শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি। আর কিছু কাজ হয়ে গেছে যারা বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় (সারভাইভাল নাম্বার)(যেমন মানুষ হয়ে ওঠা, রবীন্দ্রনাথ, সহজ জীবনের পাঠ। সহজ জীবনের পাঠে শান্ত বিপ্লবের যে ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রয়াসের পরিবেশন করা হয়েছে তা অনেক স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান নিজেদের মত করেই গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্য, বাংলায় থেকেই, বিশ্বের দিকে এগিয়ে চলেছে। অবাঙালি মানুষ ও প্রতিষ্ঠানেরাও এখন এই মতধারা গ্রহণ করছেন।

আমরা ঠিক এই লক্ষ্যেই এখনকার মত চলতে চাইছি। অন্তত আরো বছর পাঁচ-সাত এভাবে চলার কথা ভেবেছি। কিছু এসেনশিয়াল কিছু সারভাইভাল সংখ্যা করা, বছরে একটা করে। দুই, শান্ত-বিপ্লব-তত্ত্বাশ্রিত পরীক্ষা-প্রস্তুতি নিয়ে প্রচার-পাঠচক্র করা, একই সঙ্গে তৃণমূল স্তরে ও বিশ্বের আঙিনায়, যা এখন নিয়মিত চলছে। বই না পত্রিকা - একেবারেই তা বিবেচ্য নয়(শ্রয়ণ লিটল ম্যাগ না প্রতিষ্ঠান - বিবেচ্য নয়(শ্রয়ণে মুক্তবুদ্ধির ভাবুকেরা শুভ সমাজ গঠনেচ্ছুক বন্ধুরা অংশ নিচ্ছেন স্বাধীনভাবে, এবং শ্রয়ণ পারছে বিশ্বের কাছে শান্ত-বিপ্লবের কথা বলতে - এটিই এখন মুখ্য। ঐ দুই লক্ষ্যে স্থির থেকে আমরা পথ চলছি।

ইতিমধ্যে শ্রয়ণ স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা হিসেবে সরকারি নথিভুক্ত হয়েছে। মাঝে বন্ধ ছিল, ফের দু'হাজার টাকার (কিস্তিতেও দেয়া চলে) বিশেষ-সদস্যপদ নেবার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যারা হবেন তারা ইতিমধ্যে প্রকাশিত দশটি বই এখনই পেয়ে যাবেন ও প্রকাশিতব্য গ্রন্থগুলি যখন যখন বার হবে তখন তখন পাবেন। এছাড়া চারশো টাকার - আগামী চারটি গ্রন্থের জন্য - সাধারণ সদস্যও করা হচ্ছে। একেকটি গ্রন্থ প্রকাশ করতে পঁচিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা লাগে, স্পনসর করারও আহ্বান রইল। কিছু না করলেও চলে যাবে, কল্যাণ-ভাবনাটিই যথেষ্ট।

- প্রকাশিত গ্রন্থসংকলন -

ঐতিহ্য আধুনিকতা / গ্রাম ও শহর ২০০০
বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ ২০০১
নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক ২০০১
বিশ্বায়ন - বিজ্ঞান ও কৌশল ২০০২
স্বনির্ভরতা ২০০২
শ্রয়ণে রবীন্দ্রনাথ ২০০৩
সহজ জীবনের পাঠ ২০০৪
স্বাশ্রয়ভাবনা ২০০৫
মানুষ হয়ে ওঠা ২০০৭
ব্যক্তিত্ব, সমিতি ও শান্ত বিপ্লব ২০০৮
কৈশোর ২০০৯

- গ্রন্থবিবরণ ও কিছু লেখার উপস্থাপন -

ঐতিহ্য আধুনিকতা / গ্রাম ও শহর (২০০০)

যে অবস্থায় রয়েছে গ্রাম আর শহর এবং যা হলে ভালো হয় তার কথা রয়েছে 'গ্রাম-শহর' পর্বে। অন্যপর্বটি হলো 'ঐতিহ্য-আধুনিকতা', যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠার অবস্থাটি আলোচিত হয়েছে।

বৈষম্য, শৃঙ্খলা এবং নির্মাণ (২০০১)

নানা দিক ধরে বৈষম্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে তা শুরু করা হয়েছে। অতঃপর এসেছে মানবিক জীবন। সেখান থেকে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রভিত্তিক বৈষম্যের বিশ্লেষণ সেরে চেষ্টা করা হয়েছে সামূহিক জীবন যে পথে সম্ভব তার যথাসাধ্য উন্মোচন।

নিঃস্বজনের ব্যাঙ্ক (২০০১)

তৃণমূল স্তরে কাজ করে চলেছে দরিদ্র মানুষদের তিল তিল সঞ্চয়ে গড়ে ওঠা মাইক্রোব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা - এই বাংলার এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে গ্রন্থ শুরু করা হয়েছে। তারপর আসরে এসেছেন মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর লেখার সূত্র ধরে নিও-ক্ল্যাসিক্যাল রূপবিচিত্রতা, ব্যাঙ্কিং-এ জমে থাকা ঋণ-বন্ধন-ব্যবস্থা, তার ম্যানেজারিয়াল দিকের বিশ্লেষণ করেছেন এ বাংলার খ্যাতনামা তাত্ত্বিকেরা। এও বলার যে, এই গ্রন্থটি যখন পত্রিকাকারে প্রথম মুদ্রিত হয় (২০০২ সালে) তখন ইউনূস নোবেল পাননি এবং এতটা প্রচারও হয়নি মাইক্রো- ব্যাঙ্কিং নিয়ে। শ্রয়ণ তখনই বুঝে নিয়েছিল এর প্রভাব কতটা পড়তে পারে আর সেদিনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তার শুভ দিকটার সঙ্গে সঙ্গে যে যে সমস্যার দিক ফুটে উঠেছিল আজ দেখা যাচ্ছে তাই ঘটছে। সম্ভাব্য মুক্তির পথও এখানে পাচ্ছি।

বিশ্বায়ন - বিজ্ঞান ও কৌশল (২০০২)

বিশ্বায়নের শুরুটা হয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দিয়ে। বিজ্ঞান পথ দেখায়, প্রযুক্তি তার ব্যবহারিক রূপ দেয়। মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্য দিতে দিতে জাঁকিয়ে বসে বাজার। অতঃপর বাজার, যেভাবে সম্ভব, ছলে বলে কৌশলে, মানুষের গড়া সমাজ মূল্যবোধ হটিয়ে বণিকি ভাষ্য ও ভাবনা ম্যানুফ্যাকচার করে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বায়নের অগ্রসরতা বোঝা হয়েছে, অবশেষে তা কিভাবে রাজনীতি অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে এবং দেখায় তার আগ্রাসী রূপ সেটি অনুধাবন করা হয়েছে।

শ্রয়ণে রবীন্দ্রনাথ (২০০৩)

এই হত্যাসর্বস্ব দুনিয়ায় আমরা শুদ্ধ জীবনে স্থিত থাকব কিভাবে? আমাদের ব্যক্তিক সংকট, বৈশ্বিক সংকট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি আমরা আর উত্তর খুঁজতে গিয়েছি পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে, যাঁর লেখা শুধুমাত্র মুদ্রিত চিঠির সংখ্যাই সাড়ে চার-হাজারের ওপর! সেইসব চিঠিপত্র ধরে আজকের বাঁচার অনিবার্য উত্তর সম্ভব করা হয়েছে। সেখান থেকে একটি লেখা

শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

কাদম্বিনী দেবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

জান ত চারিদিক হইতে অবমাননা আমি অনেক পাইয়া থাকি(সে জন্য কাহাকেও দোষ দিই না। তপস্যাও করিব অথচ তাপ সহিব না এমন সৌখীন তপস্যার কোন অর্থ নাই। কিন্তু তবু তাপ ত তাপই বটে। তাই এই সমস্ত লাঞ্ছনার ভিতরে তোমার স্নিগ্ধ চিঠিগুলি যখন পাই তখন আমার তপ্ত ললাটে আমি আমার দেশ-মাতার সেবাহস্ত অনুভব করি। আমার কাছে তুমি শান্তির সম্বল চাহিতে আসিয়াছিলে কিন্তু তুমি অনেক সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছ। .. (১ জানুয়ারি ১৯১৫)।

মা, পত্রের মধ্য দিয়া তোমার যেটুকু পরিচয় ও তোমার কাছ হইতে যে স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাটুকু পাইয়াছি সে আমার বিশেষ সমাদরের ও আনন্দের সামগ্রী তাহা নিশ্চিত জানিয়ো। সংসারের পথে চলিবার সময় যাহা আমাদের গভীর প্রয়োজনের সামগ্রী তাহা আকারে ও পরিমাণে বৃহৎ নহে। তৃষ্ণার স্নিগ্ধ জল এতটুকু হইলেও চলে কিন্তু যখন রৌদ্র প্রখর হয় তখন তাও দুর্লভ - অথচ তপ্ত বালির অভাব নাই। .. (১৮মে ১৯১৫)।

আমি খুব অল্প মেয়েকেই জানি, যে তোমার মত এমন সংযতভাবে সুস্পষ্ট ভাবে ও একাগ্রভাবে চিন্তা করতে ও চিন্তা গ্রহণ করতে পারে। আমি

জানি আমার অনেক কথাই তোমার আজন্ম-সংস্কারের প্রতিকূল ছিল। অন্য কেউ হলে ক্ষোভে, এমন কি, অবজ্ঞায় সে সব কথা প্রত্যাখ্যান করত। কিন্তু তুমি ব্যথিত হয়েও আমার কথা স্থিরভাবে বোঝবার সহিষ্ণুতা কখনো হারাও নি।.. (১৭ এপ্রিল ১৯২৬)।
নিজের ভিতরকার ঠিক কথাটি লেখা একেবারেই সহজ নয়, - তুমি আমাকে লিখিয়েচ বলেই লিখেচি - কোমর বেঁধে সাধারণকে উপদেশ দেবার জন্যে যদি লিখ্‌তুম তা হলে বানানো কথা হত - অন্তরের সহজ কথা বল্‌তে পারতুম না।.. (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮)।

আ কা শে আ লো য় কা জ অ ব কা শে

এখনও আমার শরীরের সেই ক্লান্তি যায় নি - তাই ছুটিতেও এখানেই পড়ে আছি। আমার এই শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা আমার পক্ষে দুঃখের কারণ হয় নি। আমি কর্ম্মের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখবার অবকাশ পেয়েচি। আমাদের হাজার রকমের কর্ম্মের প্রয়াস, নিখিলের নিকট-স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে - এই বিপুল জগতের মাঝখানে কর্ম্মের পরদা খাটিয়ে অন্ধ হয়ে থাকি। যদি শরীর অসুস্থ না হত, তবে এই পর্দ্দা ওঠাবার অবসর কেউ আমাকে সহজে দিত না। তাই আজকাল আমার এই ক্লান্তি আমার অবকাশটি পূর্ণ করে মুক্তির অমৃত পরিবেষণ করচে। আজ থেকে বিদ্যালয়ের ছুটি হল - এ'তে করে আমার ঘরের আরও একটা দরজা খুলে গেল - এখন আমার সমস্ত মনের উপর হাওয়া এসে লাগুক, আলো এসে পড়ুক এই চাই। .. (১৯১৯)।

দীর্ঘকাল থেকে আমি পীড়া ভোগ করচি। কবে নিষ্কৃতি পাব জানি নে। একটা সুবিধা এই যে, কর্ম্মের ভীড় থেকে খানিকটা ছুটি পাই, তাতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সুবিধে হয় - তা ছাড়া, বাহিরের বিশ্বেও মনটাকে মুক্তভাবে ছাড়া দেবার অবকাশ ঘটে। অন্তরের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া হচ্চে পরিণত বয়সের ধর্ম্ম - আর বাইরের আকাশে ছুট্‌ দেওয়া হচ্চে ছেলেবয়সের ধর্ম্ম - এই দুদিকের দরজাই আমার খুলে গেছে সেই জন্যে কোনোরকম কাজ করতে এখন আর ভালো লাগে না, অথচ কাজেরও সম্পূর্ণ বিরাম নেই।.. (কলকাতা(৪ নভেম্বর ১৯২৫)।

স বে র ম ধ্যে স বে র উ র্দ্ধে

আমি গুরুর ন্যায় উপদেশ দেবার অধিকারী নহি - আমি হিতৈষীর ন্যায় তোমাকে পরামর্শ দিতেছি যে জীবনে প্রত্যহ একটি কোনো মঙ্গল কর্ম্ম করিয়ো যাহা নিতান্তই তাঁহার উদ্দেশে করা হইবে। যাহার জন্য যশ চাহিবেনা(যাহার প্রতিদান পাইবেনা, যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে গোপনে সম্পন্ন করিবে। তখন মনে মনে এই বলিয়ো,'ভগবান এই কাজটি সম্পূর্ণ তোমাকেই দিলাম - ইহা তুমিই জানিলে আর আমিই জানিলাম।' যদিও সংসারের সকল কাজ তাঁহারই কাজ, কারণ এ সংসার তাঁহারই সংসার - তথাপি সে সকল কাজের সঙ্গে আমাদের নানা স্বার্থ নানা বাধ্যবাধকতা জড়িত থাকে। দিনের মধ্যে অন্তত একটা কোনো কাজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক, বাধ্য না হইয়া, সমস্ত ফলকামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পার তবে সেই কর্ম্মের মধ্যে তোমার পূজা সমাধা হইবে তোমার জীবন কৃতার্থ হইবে। (....)।

মনের মধ্যে অবসাদ আসিতে দিয়োনা। 'নাত্মানমবসাদয়েৎ' আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করিবেনা শাস্ত্রের এই অনুশাসন আছে। আপনাকে যে আমরা দুর্ব্বল বলিয়া কল্পনা করি সে আমাদের একটা মোহ - নিজেকে সংসারের সমস্ত বাধা হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বরূপটি কি দেখিতে পার না? তোমার চারিদিকে যাহা কিছু জমিয়াছে তাহা ত চিরদিনের নহে। নিজেকে তাহারই সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য করিয়া দেখিতেছ কেন? নিজেকে অনন্ত সত্যস্বরূপের মধ্যে দেখ - সংসারের মধ্যে দেখিয়োনা।.. (শিলাইদা(৮ জুন ১৯১১)।

আমি এইটুকু বল্‌তে চাই যে, মানুষ যখন ভগবানকে চায় তখন ঠিক কি চায় তা যদি পরিষ্কার করে বোঝে তাহলে অনেক জঞ্জাল কেটে যায়।..
যে চাওয়া আধ্যাত্মিক চাওয়া সে তাঁকে পেতে চাওয়া নয় - তাঁর সঙ্গে মিল্‌তে চাওয়া। পৃথিবীতে কিছুর সঙ্গে আমরা মিল্‌তে পারিনে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বেদনা। আংশিক ভাবে একটুমাত্র মিলি বাকি সব জায়গায় বাধে। তার প্রধান কারণই হচ্চে সকলেই নিজের সীমা দিয়ে আমাদের বাধা দেয় - তার সঙ্গে আপনাকে সবদিক দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। স্বামীর স্বামিত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পিতার পিতৃত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব সর্ব্বত্রই অল্প কিছু দূর গিয়ে ঠেকে যায় - তার মধ্যে আত্মা আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় না।
যিনি জগৎ জুড়ে আমার পিতামাতা স্বামীবন্ধু সব হয়ে আছেন তাঁর মধ্যেই দেহে মনে আত্মায় কোথাও আমাদের আর ঠেকেনা।..
একটি কথা ভেবে দেখো আমাদের দেশে দেবতা কেবলমাত্র মূর্ত্তি নন - অর্থাৎ কেবল যে আমরা আমাদের ধ্যানকে বাইরে আকৃতি দিয়েছি তা নয় - তাঁরা জন্মমৃত্যু বিবাহ সন্তানসন্ততি ক্রোধ দ্বেষ প্রভৃতি নানা ইতিহাসের দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ - সে সমস্ত ইতিহাসকে সত্য বলে বিশ্বাস করলে ভগবানের সার্ব্বভৌমিকতা একেবারে চলে যায় - তিনি নিতান্ত আমাদের দেশের ও গ্রামের মানুষটি হয়ে পড়েন - সেইরকম বেশভূষা স্নানাহার আচারব্যবহার।
অথচ তিনিই আমাদের একমাত্র যাঁকে অবলম্বন করে, আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সঙ্কোচ অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবে - তাঁকে অবলম্বন করে আমাদের সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার বিস্তৃত হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি, স্ত্রীলোককে হত্যা করেছি, শিশুকে জলে ফেলেছি, বিধবাকে নিতান্তই অকারণে তৃষ্ণায়

দগ্ধ করেছি, নিরীহ পশুদের বলিদান করচি - এবং সকল প্রকার বুদ্ধি যুক্তিকে একেবারে লঙঘন করে এমন সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। .. আমরা কেবলি বলেছি, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমরা পারি নে, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ মঙ্গল আমাদের জন্যে নয়। অতএব আমাদের পক্ষে এই সমস্ত মুগ্ধ কল্পনাই ভাল। এমনি ধর্ম্মকে সহজ করতে গিয়ে যে তাকে কেবলি নীচু করেছে তার আর উদ্ধারের উপায় নেই। ধর্ম্মকে যে উপরে রেখেছে, ধর্ম্ম তাকে উপরে টেনেছে - হিন্দু তা করে না। হিন্দু কেবলি বলেছে মেয়েদের জন্যে সর্ব্বসাধারণের জন্যে এই রকম আটপৌরে মোটা ধর্ম্মই দরকার - এই বলে সমস্ত দেশের বুদ্ধি ও আকাঙক্ষাকে সেই মোটার দিকে ভারাক্রান্ত করে নেবে যেতে দিয়েছে। আর যাই হোক্ সাধনাকে নীচের দিকে নামতে দিলে কোনো মতেই চল্‌বে না। কল্পনাকে, হৃদয়কে, বুদ্ধিকে, কর্ম্মকে কেবলি মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে - তাকে কোনো কারণেই কোনো সুযোগের প্রলোভনেই ভুলিয়ে রাখ্‌তে হবে না। আমি নিজের জন্যে এবং দেশের জন্যে সেই মুক্তি চাই। .. (বোলপুর(৪ জুলাই ১৯১০)।

সুখ দুঃখ ছাপিয়ে

সুখ দুঃখ বাহিরের ঘটনার উপরে নির্ভর করে না - বাহিরের ঘটনা অতি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র - ঈশ্বর যাহার অন্তঃকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে। আমি অনেক লোককে জানি যাহারা সুখকর সমস্ত উপকরণদ্বারা বেষ্টিত কিন্তু চিরজীবন সুখ অনুভব করিল না। .. অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণ অধিকারের মধ্যে জীবন যখন সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে তখন জগৎ হইতে রস আহরণ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু জীবন যখন পাইয়াছ, বাঁচিতেই যখন হইবে তখন নিজের সঙ্কীর্ণ অবস্থার ঊর্দ্ধেঅনন্ত আকাশের মধ্যে মাথা তুলিতেই হইবে - আলো পাইতেই হইবে, মুক্তবায়ুর মধ্যে আত্মাকে বিস্তৃত করিতেই হইবে। বাহিরের প্রতিকূলতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। .. সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। আমি যে প্রতিমুহূর্ত্তে বাঁচিয়া আছি ইহার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হইতেছে, সেই শক্তির কণামাত্র হ্রাস হইলেই আমি তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম(এই যে এত বড় শক্তির দ্বারা বিধৃত আমি, এই যে এত বড় প্রেমের দ্বারা পরিবেষ্টিত আমি - আমার খেদ কি লইয়া? কে আমাকে কি বলিল - কে আমাকে কি বুঝিল ইহাই কি জগতে সকলের চেয়ে বড়? আমার যে এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিশক্তি একটি প্রকান্ড ব্যাপার - আমার যে একবার মাত্র নিশ্বাস লইবার ক্ষমতা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা - আমার মত এই পরমাশ্চর্য্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না। মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি তাহাকে তোমার শক্তিতে ঊর্দ্ধের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে - .. সুখই হউক দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক অপ্রিয়ই হউক যাহাই প্রাপ্ত হইবে তাহাকেই অপরাজিত চিত্তে উপাসনা করিবে। .. (৯মে ১৯০৬)।

ঈশ্বর না জানি আরো কি দাবী করিবেন সে কথা মনে করিতে ভয়ও হয়, সেটুকু দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারি নাই - কিন্তু তবু আমার মন যেন একান্তভাবে বলিতে পারে, আমার কাছে তোমার যত দাবী তুমি সমস্তই মিটাইয়া লও - তুমি কিছুই ছাড়িয়ো না - আমি সহিতে পারিব - আমি আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তাঁহার পরম দানগুলিকে দুঃখের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ করেন - তিনি বেদনার মধ্য দিয়া জননীকে সন্তান দেন - সেই বেদনার মূল্যেই সন্তান জননীর এত অত্যন্তই আপন। সেই কথা মনে রাখিয়া, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই,অমৃত চাই তখন অনেক বেদনা অনেক ত্যাগের জন্য নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে। .. সংসারের সমস্ত আচ্ছাদন আবরণের ঊর্দ্ধে জাগ্রত হও। মনে মনে বল, আমি দুর্ব্বল নই - বল আমি পরাস্ত হইব না - বল আমার ক্ষণিক জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবনের সম্বল রহিয়াছে, এ জীবনের সমস্ত জালই একে একে কাটিয়া যাইবেই কিন্তু সে সম্বল কোনোকালেই ফুরাইবে না, তারা সূর্য্যের আলোর মত অক্ষয়। ঈশ্বর তোমার মধ্যে যে মহিমা স্থাপন করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া দেখ - নিজেকে দীন বলিয়া দুর্ব্বল বলিয়া ছোট বলিয়া অপমান করিয়োনা, কারণ তাহা কখনোই সত্য নহে। তোমার অন্তরাত্মার মধ্যেই বিজয়লক্ষ্মী বসিয়া আছেন তাঁহাকে দেখিলেই তোমার আর কোনো ভয় থাকিবে না - তুমি যে কি মহৎ তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবে - তুমি ঈশ্বরের আনন্দের ধন - এই বার্ত্তা নিজেকে শুনাইয়া দাও! যাহা ঘটুক, ঘটনা সমস্তই তোমার আত্মার কাছে তুচ্ছ - তোমার চেয়ে বড় কেহই নাই সেই জন্যেই সকলের মধ্যেই তুমিও আছ। তোমার কিছুতে ভয় নাই, কিছুতেই ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তোমার। .. (ভবানীপুর(১৭ এপ্রিল ১৯০৭)।

মাতঃ, ঈশ্বর আমাকে বেদনা দিয়াছেন কিন্তু তিনি ত আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই - তিনি হরণও করিয়াছেন পূরণও করিবেন। আমি শোক করিব না - আমার জন্যে শোক করিয়ো না।

আমার শরীর ভালই আছে। আমার কন্যাদুইটিকে লইয়া কিছু দিনের জন্য শিলাইদহে পদ্মার বক্ষে বাস করিতে প্রস্তুত হইতেছি। .. (কলকাতা(৫ ডিসেম্বর ১৯০৭)।

তোমার জীবনের মধ্যে কি কাজ চলিতেছে তাহা তুমি জান না - তিনিই জানেন। তুমি মনে করিতেছ তোমার নৈরাশ্য তোমার ব্যর্থতা তোমার দুর্ব্বলতাই বুঝি চিরসত্য - তাহা তোমার একটা দুঃস্বপ্নমাত্র - হঠাৎ যেদিন তিনি তোমাকে জাগাইয়া দিবেন তখন দেখিবে অবসাদের আর লেশমাত্র নাই। ইতিমধ্যে যথার্থ আপনার উপর আস্থা স্থাপন কর, অবস্থা যেরূপই হউক্, সংসার সংগ্রামে তুমি যতবারই পরাভূত হও তবু

জানিয়ো তাহাই চরম নহে - তাহা ভেদ করিয়াও তুমি পরম চরিতার্থতা-লোকে প্রকাশিত হইবে - তোমার সকল বেদনার মধ্যে নিত্যই তুমি সেই দিকে চলিয়াছ। মাটির মধ্যে হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেও আকাশের আলোকে বাহির হইবার মুখে সে কাজ করিতেছে তাহা সে জানেনা - সে আপন অন্ধকারকেই প্রবল এবং চিরন্তন বলিয়া ভুল করে। এই অকারণ দুঃখ হইতে তুমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া আনন্দিতচিত্তে সফলতার জন্য প্রতীক্ষা কর। .. (শিলাইদা(২৩ জুন ১৯১১)।

মা, এই জগৎসংসারে সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্য যে কতদিকে কত পূর্ণ হইয়া আছে একবার সমস্ত মন দিয়া তাহা গ্রহণ কর তাহা হইলেই নিজের মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র যাহা কুশ্রী তাহা মিলাইয়া যাইবে। অতি বিরাট সঙ্গীতে আকাশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে - জীবনের আবরণ মোচন করিয়া একবার সেই সঙ্গীতে দেহমনকে মগ্ন করিয়া ধৌত করিয়া নববর্ষে নূতন জন্ম লাভ কর। পুরাতনকে বারবার ত্যাগ করিয়া তবে আমরা অমৃতলোকের . যাত্রায় অগ্রসর হইতে পারিব। যে পুরাতন মলিন, যাহা নির্জ্জীব, যাহা জীবনের উপর ভারের মত, তাহাকে প্রাণপণে এই জগদ্ব্যাপী আনন্দসাগরে সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিসর্জ্জন দাও - নিজের ভিতরকার মৃত্যুহীন পবিত্র অমৃত রূপটি দেখ - দেখ একবার জীবন কি মহৎ, জগৎ কি আশ্চর্য্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী তিনি কি অন্তরতম - দুঃখগ্লানির ছায়ার খেলা কি তুচ্ছ, মানুষের আত্মার শক্তি মানুষের সংসারের অভিঘাতের চেয়ে কত বড়! এই নববর্ষ তোমার জীবনে সার্থক হউক্। .. (শান্তিনিকেতন(১৮ এপ্রিল ১৯১৫)।

ব্যথা এড়াব এমন সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু তাকে সত্যরূপে গ্রহণ করব এটা আমাদের সাধনার অঙ্গ। যিনি চিরন্তন তাঁকে যদি দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে রাখ্‌তে পারি তাহলে যে চঞ্চল সে আমাদের আর আঘাত করতে পারে না। আমরা নিজেকে যখনই বড় করে দেখি তখনি নিজের ভার অত্যন্ত বেড়ে ওঠে - তখনি দুঃখসুখের ঢেউ বড় বেশি তোলপাড় করে তোলে। - নিজেকে এবং প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতাকে নিজের সত্য-আপন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে দূরে রেখে দেখ্‌লে জীবনযাত্রা সহজ হয়। যে দুঃখে আমরা মরি সে আমাদের নিজের হাতের মার। তার মানে এই নয় যে সেই দুঃখের ঘটনা আমাদের নিজের সৃষ্টি, তার মানে এই যে, সেই ঘটনাকে আঘাতস্বরূপে নেওয়া আমাদের নিজেরই কাজ। .. (শান্তিনিকেতন(৯ জানুয়ারি ১৯১৮)।

তোমার চিঠিখানি পেয়ে সুখী হলুম, সেই সঙ্গে মনে উদ্বেগ বোধ করচি। তোমার শরীর নিশ্চয় ক্লান্ত, তাই প্রাণশক্তির ম্লানতায় তোমার মনের মধ্যে অবসাদ আসচে। এই ম্লানতায় মাকড়ষার জালের মতো আমাদের জড়িয়ে ফেলে - বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অনেকখানি বিচ্ছিন্ন করে দেয় - সবটা আলো আমাদের দৃষ্টিতে পৌঁছয় না, সবটা হাওয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে নিঃশ্বসিত হতে পারে না। ক্ষীণ জীবনের জীর্ণ শিকড়গুলো অস্তিত্বের সব রস পূরোপূরি শুষে নিতে জোর পায় না। তোমার সঙ্কল্পের আবেগের সঙ্গে তোমার প্রাণশক্তি-দৈন্যের অসামঞ্জস্য ঘটেচে সেই জন্যে এত বেশি কষ্ট পাচ্চ। তোমার অন্তরে বাহিরে ভালো রকম মিল হতে পারচেনা। ন্যূনাধিক পরিমাণে এই অসামঞ্জস্য সকলেরই জীবনে আছে। এই অসামঞ্জস্যের আঘাতের প্রয়োজনও গুরুতর। মাটি উঁচু নীচু, এবং ভিন্ন স্থানে তাপমাত্রার ভিন্নতা বশতই পৃথিবীতে জলের ধারা চলে, বাতাস বয়। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অসাম্য আছে বলেই আমাদের চিত্তপ্রবাহ আঘাতে অভিঘাতে সর্ব্বদা জাগরিত। অথচ এই অসাম্য অতিশয় অতিরিক্ত হলে তাতে আমাদের শক্তিকে নিরস্ত করে, উদ্দীপিত করে না। এ কথা এত করে এই জন্যে বলচি,যে, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে অবস্থার দৈন্য, কর্ম্মের বাধা, শরীরের দুর্ব্বলতায় আমার জীবনেও একটা ঔদাস্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটাকে চরম বলে স্বীকার করে নিতে পারিনে। সেটা মায়াজাল, তার থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাই। ছায়াকে সত্য বলে জানা ভূতের ভয় পাওয়ার মত - যেই বল্‌তে পারব সেটা মিথ্যে, অম্‌নি তার জোর চলে যাবে। অবসাদের উপছায়াকে বার বার বোলো, মিথ্যা মিথ্যা - তোমার যে-আত্মা সত্য তাকে নিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে নিশ্চিত জানো, প্রতিদিনের আঘাত জর্জ্জরতা কেটে যাক্। .. (১৬ এপ্রিল ১৯২৭)।

বিশ্বনীড় - বিশ্বমনন

যে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি সেখানে একটা প্রবেশাধিকার পাওয়া দরকার। এখান হইতেই ত পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইবে। পালা শেষ না করিতে পারিলে ত ছুটি নাই - মনুষ্যত্বের পালাটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সকল দিকেই পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্যকার যুগে পৃথিবীর একটা মস্ত শক্তির ক্ষেত্র য়ুরোপ - সেখানে এমন একটি বিরাটের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা সমস্ত জগৎটাকে টলাইতেছে - যাহা বিদ্যুৎকে বাঁধিতেছে, পৃথিবীকে দোহন করিতেছে, মানুষের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করিতেছে - তাহাকে যদি ভাল করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া না যাই তবে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের কাছ হইতে ঠিকমত বিদায় লওয়া হইবে না। কেন আমি এ যুগে জন্মিয়াছিলাম? কলসি আনিলাম কিন্তু ভরিয়া লইবার জন্য ঝরনার ধারে গেলাম না। এখনকার কালে যে ঝরনা ঝরিতেছে তাহার ধারা কি এ জীবনে ব্যর্থ করিতে দিব? .. তাই মনটাকে মুক্ত করিতে চাই - আত্মীয় স্বজন ঘর দুয়ার ও স্বদেশ সমাজের লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম অভ্যাসের জাল কাটিয়া একবার সমস্ত মানুষের দলে আপনাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চাই। তাহা হইলেই বলিতে পারিব মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম। আমি বাঙালী হইয়া ঠাকুরবাড়িতে জন্মিয়াছি এই ত আমার শেষ পরিচয় নহে। .. (শিলাইদা(৫ মার্চ ১৯১২)।

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে কালই আমি ভারতবর্ষ যাত্রা করিতেছি এবং আমার প্রবাসের শেষদিনে তোমার পত্রে আমি যেন মাতৃভূমির আহ্বান লাভ করিলাম।

এদেশে আমি সমাদর পাইয়াছি কিন্তু সেইটেকেই আমি সকলের চেয়ে বড় লাভ মনে করিনা। কিন্তু ভগবান যে জন্য আমাকে এদেশে টানিয়া আনিয়াছেন তাহার সন্ধান পাইয়াছি। তিনি আমার কাছে বিদেশীর ভিতর দিয়া আত্মীয়ের মূর্ত্তি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

আমি শুধু বাহবা পাই নাই আমি হৃদয় পাইয়াছি। মানুষ যে মানুষের কত কাছে তাহা দেখিয়াছি। ভাষা, ধর্ম্ম, ইতিহাস, আচার ও গিরি নদী সমুদ্রের ব্যবধান কতই তুচ্ছ - যেখানে সত্য মানুষটি বাস করে সেখানে কোনো ভেদ নাই। সেই ভেদবুদ্ধির হাত হইতে মুক্তি না পাইলে তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, মানুষের কাছে তাঁহার অখন্ড প্রকাশই মানুষের পক্ষে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেই প্রকাশকে আমরা বর্ণভেদ বিজাতিবিদ্বেষ প্রভৃতি সহস্র আকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলি - সেই আচ্ছাদন সরাইয়া ফেলিতে হইবে - নহিলে এই পৃথিবীর মহাতীর্থে মানুষের হৃদয়মন্দিরে দাঁড়াইয়া মানুষের হৃদয়েশ্বরের পূজা সমাধা হইবেনা, বৃথা দ্বারের বাহির হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। .. (৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)।

ছোট ছেলেকে শিক্ষার প্রণালী কোনো বই থেকে পাবে না। আমি ছেলেদের বই দেখে শেখাই নে। মুখে বলে', বলিয়ে নিয়ে, এবং লিখে লিখিয়ে তাদের গ্রহণ করবার এবং প্রকাশ করবার শক্তিকে জাগিয়ে তুলি। সে প্রণালী অত্যন্ত সহজ বলেই শক্ত। .. (১৫ এপ্রিল ১৯১৬)।

মুক্তি স্বাধীনতা ও জীবনের অর্থ

আমাদের জীবনের ক্ষেত্র ছোটো, তার উপকরণও সীমাবদ্ধ - সেই ক'টিকে নিয়ে সেইটুকুর মধ্যে একটি মূর্ত্তি সাজিয়ে তুল্‌তে হবে। সুখ দুঃখ জিনিসটা চরম জিনিষ নয়, তার উপাদানমাত্র, তাদের নিয়ে একটি সুসঙ্গতির মধ্যে গুছিয়ে তুলে জীবনটাকে রূপ দিতে হবে। নিজের জীবন রচনায় আমরা আর্টিস্‌ট্‌। যদি তাকে একটি সুষমা দিতে পারি তাহলেই যিনি নিত্য আমাদের জীবনে তাঁর প্রকাশ হয়। রেখা রঙ নিয়ে আঁক কাট্‌লেই ছবি হয় না - তাদের মিলিয়ে নিয়ে যখন রূপ ফুটে ওঠে তখন সেই রূপ নিত্যতা লাভ করে। ছবি আঁকতে হলে এমন কোনো ভাবকে গ্রহণ করতে হয়, যে ভাবের মধ্যে পূর্ণতার রস আছে, সেই মূল ভাবের অনুগত করে রেখা ও রঙের বিন্যাস সাধন করা চাই। নিজের জীবনের সম্বন্ধেও তাই, সমস্ত সুখ দুঃখ সমস্ত চাওয়া পাওয়া যদি এলোমেলোভাবে থাকে তাহলে সৃষ্টি হল না - কোনো একটি চিরন্তন ভাবের সঙ্গে সঙ্গত করে তাদের শান্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা দিতে হবে - জীবনের অর্থ হল এই। .. (শিলং(২৯ মে ১৯২৭)।

যে ধর্ম্ম আমাদের উপরের জিনিষ, উপনিষৎ যার পথকে 'ক্ষুরধারনিশিত' দুর্গম বলেছেন, যাকে লাভ করবার জন্যে আমাদের সমস্ত শক্তিকে সচেষ্ট রাখা আবশ্যক, তাকে আমরা যথেচ্ছমত সস্তা করে নিয়েছি - এবং ক্রমাগত বলে এসেছি আমরা পারি নে, এ সব ধারণা আমাদের সাধ্যের অতীত, আমরা নিকৃষ্ট অধিকারী, আমাদের পক্ষে সত্যের বিকারই একমাত্র অবলম্বনীয়। নিজেকে দুর্ব্বল বলে স্বীকার করে নিজের ধর্ম্মকে যদি খাটো করি তবে কে আমাদের বল দেবে? ধর্ম্মকেই যদি নীচে রাখি তবে আমাদের উপরে তুল্‌বে কিসে? কিছুতেই তুল্‌চেনা, কিছুতেই জাগ্‌চিনে, আমরা প্রতিদিন মরচি তবু প্রতিকারের ইচ্ছামাত্রও নেই। এখন আমাদের এমন সময় এসেছে যখন এই সমস্ত মোহজঞ্জালকে চিরাভ্যস্ত মমত্ববুদ্ধিবশত স্বদেশের মর্ম্মস্থানে গুরুভার পর্ব্বতের মত স্তূপাকার জমিয়ে রাখা আর চল্‌বেনা।

আমি জানি সত্যের পথ সহজ নয় - পিছনে টেনে রাখবার যে কত বন্ধন আছে তার ঠিকানা নেই - যদি মনে করি একে একে একটু একটু করে সে সমস্ত শিথিল হতে থাক্‌বে তাহলে নৈরাশ্য আসে কিন্তু ঈশ্বর যখন রুদ্রবেশে দয়া করেন তখন তিনি এক আঘাতেই অকস্মাৎ অনেক বন্ধন ছেদন করে দেন - তখন তিনি অসহ্য বেদনা দেন কিন্তু সেই বেদনাকে সার্থক করেন। আমাদের দেশ তাঁর সেই বিশ্ব-উদ্বোধন প্রচন্ড আঘাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে না তা আমি বেশ অনুভব করচি এবং সেই দুঃখময় শুভদিনের জন্য নম্রশিরে প্রতীক্ষা করে আছি। .. (শিলাইদা(১৩ জুলাই ১৯১০)।

হোক্ না সংসার প্রতিকূল, সমস্ত সংসারের চেয়ে তোমার আত্মা অনেক বেশি বড় - আজ যাহার কাছে হার মানিয়া কান্নাকাটি করিতেছ হঠাৎ দেখিবে তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা। সে ধোঁয়ার মত তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে - এই ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিতে প্রকান্ড কিন্তু তোমার মধ্যে যে মৃত্যুহীন শিখাটি রহিয়াছে তাহা দেখিতে ছোট হইলেও পর্ব্বতপ্রমাণ ধোঁয়ার চেয়ে বড়। আমি পুনশ্চ বলিতেছি তোমার দুঃখ অবসাদ যতই প্রবল হৌক্ না কেন, তোমাকে তাহা যতই পীড়া দিক্ না কেন তবু আমি তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মানিব। তাহার দ্বারা তুমি নিজেকে ছোট করিয়া দেখিয়োনা - অন্তরের মধ্যে নিজের মহত্ত্বকে ধ্রুব রূপে অনুভব কর এবং ঈশ্বরের সঙ্গেই তোমার নিত্য সম্বন্ধকে অন্য সকলের চেয়ে সত্য করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা কর। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তুমি জয়ী হইবেই, তীরে উত্তীর্ণ হইবেই, রক্ষা পাইবেই ইহা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া জানিয়ো। তোমার জীবনের ইতিহাস একলা তোমার ইতিহাস নহে - ইহার মধ্যে সমস্ত জগতের মঙ্গলের ইতিহাস আছে - অতএব বিশ্বেশ্বর তোমাকে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না - তোমার অদ্যকার ব্যর্থতার বেদনা সমস্ত বিশ্বের তপস্যার অগ্নিকে ইন্ধন জোগাইতেছে। তুমি কেবলমাত্র একটি অন্তঃপুরের গৃহকর্ম্মরতা অখ্যাত রমণী নহ - তুমি বিশ্বের মানুষ, তুমি ঈশ্বরের আপন। .. (শিলাইদা(১১ জুন ১৯১১)।

ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। .. আমি বলি, স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না(দেশের যে অবস্থা ঘট্‌লে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না - তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র - তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। যে সব কাজে মনের সমস্ত শক্তির জাগরণ ও দীর্ঘকালের ত্যাগস্বীকার চাই সে কাজে যখন আমাদের কোনো উৎসাহ দেখি নে যখন দেখি তারা নিরন্তর তীব্র হৃদয়াবেগের নেশায় মেতে থাকতে চায় 'তদা ন সংশে বিজয়ায়, সঞ্জয়'। .. (৫ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেচ। দেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই একথা আমি কখনই বলি নে। কিন্তু উন্মত্ত হয়ে কিছু একটা করাই কর্ত্তব্য এ আমি মানতে পারি নে। সেই মাতামাতির একটা সুখ আছে তা জানি কিন্তু ফল না থাকতে পারে। এখানে একটা গ্রামে আগুন লেগেছিল। অবশ্য, আগুন লাগ্‌লে জল দিয়েই নেবাতে হয়, সকলেই তা জানে, কিন্তু গ্রামে জলাশয় ছিল না। তবু জল জল রবে চেঁচামেচি পড়ে গেল, সেই চিৎকারে আগুন নিব্‌লনা - এবং অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতেও ভুলে গেল। একজন বিদেশী লোক ছিল, সে বল্‌লে যে সব ঘরে আগুন লেগেচে তার চারদিকের ঘরগুলোকে ভেঙে ফেল যাতে আগুন পাড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে। গ্রামের লোক এ পরামর্শ শুন্‌তে চাইল না তখন সেই বিদেশী লোক বেত হাতে (এটাও কি শেখার নয়? - স,শ্র) তাদের জোর করে ঘর ভাঙিয়ে আগুনকে দমন করলে। এখন যেখানে আছি এই ঘটনাটি তার নিকটের পাড়াতেই ঘটেছিল। .. (শিলাইদা(২৮ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তাকে তুমি নিরুদ্ধ করে কেন রাখ? অন্তত তাকে নিজের কাছে প্রকাশ করতে পারলেও তোমার উপকার হবে। প্রকাশের দ্বারাই নিজের কাছ থেকে নিজে আমরা লাভ করি - আমাদের পক্ষে সেই লাভ সকলের চেয়ে সত্য। গাছ আপনার ফলফুলপল্লব বিকাশের দ্বারাই আপন সম্পদ পায় - বাইরে থেকে তার ডালে বহুমূল্য জিনিষ ঝুলিয়ে দিলে সে তার পক্ষে ভার হয় মাত্র। .. (১৬ফেব্রুয়ারি ১৯২৭)।

চিত্ত যখন উদ্ভ্রান্ত হয় তখন মানুষ বাইরে আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় কিন্তু মানুষের উপর আদেশ আছে তাকে আপনার আশ্রয় আপনি সৃষ্টি করে নিতে হবে। নিজের অন্তরের মধ্যে যতক্ষণ না ফিরিয়ে আনতে পারি ততক্ষণ সংসারের দীর্ঘ ও জটিল পথের আর অন্ত পাইনে। সব ভ্রমণ ও সব সন্ধানের শেষ নিজের মধ্যেই এইটে বুঝতে আমাদের অনেক সময় লাগে। .. মানুষের জন্মকাল থেকে হাজার পথে বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াই তার মনের অভ্যাস - কোন্ শক্তির দ্বারা সেই অভ্যাসকে দমন করা যেতে পারে এইটেই দুরূহ প্রশ্ন। এ সব বিষয়ে যেটা লক্ষ্য সেটাই উপায়। আর্থিক ব্যবসায়ে টাকা দিয়ে টাকা পেতে হয় - এও সেই রকম - নিজের মধ্যে পাথেয়রূপে যদি আনন্দ থাকে তবে সেইটেই গম্যস্থানের আনন্দনিকেতনে নিয়ে যায়। .. (শান্তিনিকেতন(১৬অক্টোবর ১৯২৯)

মূর্তি পূজা ও মূঢ়তা

প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য বলে না মনে করা যায় তাহলেই কোনো মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির করে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে একথা আমি মনে করি নে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে কিন্তু সে হচ্চে যেখানে তিনি খান পরেন - সে কেবল মানুষেরই মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন - অন্য কোনো রকম করে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়। .. (১৮মার্চ ১৯১২)।

হৃদয় আপনার কাজ আপনার নিয়মে করে তাহার সঙ্গে বুদ্ধির নিয়ম মেলেনা এবং না মিলিলে কোনোই দোষ নাই। কিন্তু সে স্থলে সত্যভাবেই হৃদয়টি থাকা চাই নইলে তেমন মূঢ়তা আর কিছুই হইতে পারে না। মা ছেলেকে আদর করিবার সময় আধ আধ প্রলাপ বকিয়া থাকে - কিন্তু তাহা মিষ্ট এবং সত্য। কিন্তু মাতৃস্নেহ হইতে বাদ দিলে তেমন অদ্ভুত ও অসঙ্গত আর কি আছে! মাতাকে শিশুর আদর করার প্রণালী শিখাইতে হয় না - শিশুকে ভুলাইবার যে সমস্ত প্রচলিত অর্থহীন ছড়া আছে তাহাও মা যখন স্নেহের স্বরে ব্যবহার করে তখন তাহা নূতন ও সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু যদি কেহ শাসনের দ্বারা এই প্রণালীকে কৃত্রিম করিয়া ইহাকে নির্ব্বিচারে সর্ব্বজনের ব্যবহার্য্য করিয়া তুলে তাহা হইলে মূঢ়তায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কারণ ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি দুর্লভ অথচ কেবলমাত্র স্বভাবভক্তই সে পদ্ধতিতে সত্যভাবে চলিয়া তাহার সফলতা সহজে লাভ করিতে পারে তাহাকেই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র পন্থা করিলে জ্ঞানের পথ ত রুদ্ধ হয়ই, হৃদয়ের কার্য্যও বিকৃত হইতে থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে জ্ঞানের বিষয়ে নকল চলে, এমনকি নকল করিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয় কিন্তু হৃদয়ের বিষয়ে নকল চলে

না, নকল করিলে তাহা অসহ্য ভার হইয়া পীড়ার সৃষ্টি করে। এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তির যে প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর - তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশি সঞ্চয় করে। ইহাতে কেবল অল্প কয়জনের উপকার হয় কিন্তু সমস্ত জাতিকে অন্ধ ও স্বাধীন বুদ্ধিবিচারহীন করিয়া নষ্ট করে। সেই দুর্গতি কি সমস্ত দেশের মধ্যে দেখিতেছ না? ইহারা যে কোনোমতেই কোনো মঙ্গলকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেনা কেবল সমাজশাসনের দ্বারা বলপূর্ব্বক চালিত হইয়া স্বজাতিকে জড়ত্বে ও চিরদাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছে তাহার মূলে কি এই পূজার্চ্চনাবিধি নাই? .. (কলকাতা(২২ মে ১৯১২)।

আ মি

একটি কথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পরিবারে যদিও আমার জন্ম তবু ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে আমার মন কোনো সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। তার একটা কারণ, অতি শিশুকালেই আমার মধ্যে কবি প্রকৃতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল - আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্ব্বদা বিভোর হয়ে ছিলুম - ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।

তার পরে আমার বয়স যখন ১৩।১৪ তখন থেকে আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করেছি - তার ছন্দ রস ভাষা ভাব সমস্তই আমাকে মুগ্ধ করত।

যদিও আমার বয়স অল্প ছিল তবু অস্ফুট রকমেও বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে আমি প্রবেশ লাভ করেছিলুম।

এই বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেক বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি। এমন কি, আমাদের সমাজের ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে আমি বিশেষ যুক্ত ছিলুম না - সম্পূর্ণই উদাসীন ছিলুম। তার পরে আমার স্বদেশ অভিমানও বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত প্রবল। সেজন্যও, যা কিছু আমাদের দেশের তাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলুম - বরঞ্চ প্রতিকূল কিছু শুন্‌লে জোর করে নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব ছিল।

এই সকল নানাকারণে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেন নি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেন নি।

এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক। কারণ, তোমার এটুকু জানা আবশ্যক কোনো সাম্প্রদায়িক

সংস্কারবশত অন্ধভাবে আমি কোনো কথা বলচিনে। যখন থেকে আমি আমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনে আমার অন্তরতর প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যাকুলতার প্রেরণায় সাধনার পথে প্রবৃত্ত হলুম তখন থেকে আমার পক্ষে যা বাধা তা বর্জ্জন করতেই হয়েছে এবং যা অনুকূল তাই গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ যখন মানুষের সত্যকে না হলে নিতান্ত চলেনা তখন সে দেশের খাতিরে বা সংস্কারের টানে কল্পনার ইন্দ্রজাল দিয়ে নিজেকে আর ভুলিয়ে বেড়াতে কোনোমতে পারে না - এমন কি, সে রকম ফাঁকিতেতার অত্যন্ত একটা ধীক্কার বোধ হয়। যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারি নে।.. (বোলপুর(৪ জুলাই ১৯১০)।

যে মনুষ্যলোকে আসিয়াছি সেখানে একটা প্রবেশাধিকার পাওয়া দরকার। এখান হইতেই ত পাথেয় সঞ্চয় করিতে হইবে। পালা শেষ না করিতে পারিলে ত ছুটি নাই - মনুষ্যত্বের পালাটা সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাকে সকল দিকেই পূর্ণ করিয়া যাইতে হইবে। অদ্যকার যুগে পৃথিবীর একটা মস্ত শক্তির ক্ষেত্র য়ুরোপ - সেখানে এমন একটি বিরাটের আবির্ভাব হইয়াছে যাহা সমস্ত জগৎটাকে টলাইতেছে - যাহা বিদ্যুতকে বাঁধিতেছে, পৃথিবীকে দোহন করিতেছে, মানুষের চিত্তসমুদ্রকে মন্থন করিতেছে - তাহাকে যদি ভাল করিয়া দেখিয়া ও চিনিয়া না যাই তবে পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগের কাছ হইতে ঠিকমত বিদায় লওয়া হইবে না। কেন তবে আমি এ যুগে জন্মিয়াছিলাম? কলসি আনিলাম কিন্তু ভরিয়া লইবার জন্য ঝরনার ধারে গেলাম না। এখনকার কালে যে ঝরনা ঝরিতেছে তাহার ধারা কি এ জীবনে ব্যর্থ করিতে দিব? .. তাই মনটাকে মুক্ত করিতে চাই - আত্মীয় স্বজন ঘর দুয়ার ও স্বদেশ সমাজের লক্ষ লক্ষ স্থূল সূক্ষ্ম অভ্যাসের জাল কাটিয়া একবার সমস্ত মানুষের দলে আপনাকে ভর্ত্তি করিয়া লইতে চাই। তাহা হইলেই বলিতে পারিব মানুষের পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম ও মানুষের পৃথিবী হইতে বিদায় লইলাম। আমি বাঙালী হইয়া ঠাকুরবাড়িতে জন্মিয়াছি এই ত আমার শেষ পরিচয় নহে।.. (শিলাইদা(৫ মার্চ ১৯১২)।

মা, তোমার সঙ্গে দেখা হইলে হয়ত কথা বুঝাইয়া বলা সহজ হইত কিম্বা হয়ত হইত না। ঈশ্বর ত আমাকে গুরুর আসনে বসান নাই - আমি ত কাহাকেও পথ দেখাইবার শক্তি রাখি না - কেন না আমি কবি মাত্র - আমি পথ চলিতে চলিতে গান গাহি - গম্যস্থানের খবর লইও না কাহাকেও দিই না। কেহ যখন জিজ্ঞাসা করে কেমন করিয়া সাধনা করিব আমি বলি আমি ত সাধনা করি নাই। - আমাকে ঈশ্বর যে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন সেখানে যে আমি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইয়াছি তাহা নহে - প্রথম হইতেই বিস্তর আঘাত সহিয়াছি - কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই এই পৃথিবীর আলো এবং আকাশ, এখানকার প্রাণের লীলা এবং শক্তির তরঙ্গবেগ আমার মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়াছে। জগতের মাঝখান দিয়া আমি অচেতনভাবে চলিয়া যাই নাই - ইহার স্পর্শাভিঘাতে আমার চিত্তবীণার সমস্ত তার অহরহ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ঝঙ্কারই আমাকে মন্ত্র দিয়াছে। আমার প্রাণের রাস্তা দিয়া আমার গানের সুরের ভিতর দিয়াই আমি যাহাকিছু লাভ করিয়াছি। আমার সমস্ত জীবনব্যাপী সুতীব্র

সুখদুঃখের পরিণতিই আজ একটি নমস্কাররূপে মাটি স্পর্শ করিল। এই জীবনের ব্যাপার যে কেমন করিয়া ঘটে সে রহস্য ত আমার জানা নাই - সেই জন্যই আমি কাহাকেও উপদেশ দিতে পারি না - যাহারা আমাকে ভক্তি করে তাহাদের সে ভক্তি আমি কখনই মনের মধ্যে গ্রহণ করি না। .. (বোলপুর(৪ মার্চ ১৯১৪)।

সহজ জীবনের পাঠ (২০০৪)

ফিরতে হবে সহজ জীবনে(যাতে অভ্যস্ত হতে পারলে আমরা পারব অর্থসাম্রাজ্যের কলুষতা থেকে নিষ্পাপ মনুষ্যত্বে ফিরতে - সেই জীবনের পরিচয়।

জীবনের সহজ পাঠ

গ্রন্থের শেষ পর্বে আমরা একটি কার্যকর পরিকল্পনা পেশ করব। আমাদের বন্ধুরা এইভাবে জীবন নির্বাহ করছেন, পরীক্ষা করছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার রেশ ধরেই আমাদের এই প্রস্তাবনা।

১

প্রথম ভাবনা - ব্যক্তির নিত্যযজ্ঞ

জীবনে ভালভাবে থাকতে আমরা সকলেই চাই। সেই থাকার একটি দিক হলো মেটেরিয়াল প্রয়োজনের নিবৃত্তি - খাওয়া থাকা পোষাক ইত্যাদি পার্থিব প্রয়োজনগুলো মেটানো। দ্বিতীয় দিক হলো, মনের শান্তি - সেটি সবসময়ের জন্য বজায় রাখা। প্রশ্ন হবে কিসে শান্তি? উত্তরে বলব - এক, আমার সত্যস্বরূপের সঙ্গে সবসময়ের সান্নিধ্য পাওয়া(দুই, উপভোগ করা আমার সহজতা কল্যাণকর্ম শান্তভাব ও সুন্দরপ্রিয়তা(তিন, স্থির মনে প্রতিটি মুহূর্তকে সহজ করা সুন্দর করা সর্বকল্যাণকর করে তোলা। এটিই আমার শান্তিকর্ম এবং শান্ত-অভ্যাস। বলতেন সারদা-মা - সন্তোষের সমান ধন নেই। স্রেফ এখন এখনই প্রশ্নটি নিজেকে করে দেখি না কেন - আমি কি এই মুহূর্তে সন্তুষ্ট? কিসে আমার অসন্তোষ? ভাবতে থাকলেই মন শান্ত হয়ে আসবে।

প্রথম দিকটি অর্থাৎ মেটেরিয়াল প্রয়োজনের নিবৃত্তি একেক জনের একেক ধাঁচের - যার যেমন আয় তার তেমন ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষাটি আমরা অনেকেই করে দেখেছি যে, খুব কমের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রার মধ্যেও ভাল থাকা যায় যদি, দ্বিতীয় দিকটি, অর্থাৎ মনের শান্তির দিকটি নিয়ে নিত্য পরীক্ষায় প্রস্তুত থাকা যায়। এই পরীক্ষা আপনি করতে পারেন। এটি রোজের কর্ম রোজের অভ্যাস। আপনি যতটা পারবেন ততটাই শুদ্ধ জীবনের স্বাদ পাবেন আর তা পেতে শুরু করলেই আপনার মধ্যে তা সর্বদা
পালনযোগ্য বলে জেদ জাগবে। আপনার ভাল থাকার সঙ্গে আমাদের বলার সম্পর্কটা
এই যে, এতে সমাজ, প্রকৃতি আর মানুষ সমৃদ্ধ হচ্ছে। আমরা এই নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করব - সমাজপ্রকৃতিই আমাদের মানুষ করেছে (প্রতি মুহূর্তের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কথাই ভেবে দেখুন না কেন), আমরা যদি ফিরে কিছু না করতে পারি তাহলে পরের সারির প্রাণেরা বঞ্চিত রয়ে যাবে। এটাই হোক আমাদের চিন্তা, দায়বদ্ধতা।

মনের শান্তি পেতে হলে আমার কাজ হবে - এক, যে সময়ে রয়েছি তাকে সহজ করা, জটিলতার বিপরীতে। দুই, সুন্দর করা, অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত না করে। তিন, শুভময় করা, যাতে এক কাজেই অনেকের মঙ্গল করা যায়। সব মিলিয়ে, একটি শুদ্ধ কর্মে দিনের একটা সময় নিয়োজিত থাকা, যা অবসাদকে জোর করে কাটিয়েই করতে হবে ও নিজেকে জোরের ওপর উদ্দেশ করে জানাতে হবে যে, এই তো আমি আমাকে ছাড়িয়ে শুভ ও সুন্দর কর্ম করতে পেরেছি। তেমন কাজ যে কতধরনের তা তো এই বই পাঠেই বোঝা যায়। কথা পুনরায় - 'স্বকর্মে দৃষ্টি রাখ, লভিবে সন্তোষ'। এক, নিজের কাজের দিকে নজর রাখা(দুই, সেই ক্ষণে যা পাচ্ছি তাতে কি তুষ্ট নই আমি, কতটা চাইছি আমি - তা ভাবা।

প্রশ্ন করব, সময় আমাদের কাটে কি করে? উত্তর - কিছুটা সময় সংসারপরিবারে, কিছুটা যায় পথে, বেশিটা জীবিকাক্ষেত্রে, অতঃপর জীবনের কিছু কাজে নাহলে রিল্যাক্স করে। আমরা এটাকেই একটু অন্যভাবে চেলে নিতে পারি। এক, সংসার পরিবারে জীবনটা যত সহজ করা যাবে (খাওয়াদাওয়া পোষাক ইত্যাদি কাজগুলো সহজ করলে, অল্পেই শোভন করতে শিখলে)(দুই, জীবিকাকর্মে সৎ থেকে অন্যের সেবা করার সদিচ্ছা রাখলে (অন্যের দুঃখটা বুঝলেই কাজ সহজ হয়ে যায়)(তিন, নিজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেই সমাজের অনালোকিত মানুষদের এবং মা-প্রকৃতির জন্য নিঃস্বার্থ কিছু করলে (যা করা খুবই সহজ) আমার হাতে উদ্বৃত্ত কিছু সময় শ্রম ও অর্থ এসে যায় (সহজ জীবনযাপনের এটাই প্রাপ্তি) - যা দিয়ে আমি আমার জীবনের কোন সুপ্ত স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারি। পারা যায়। আর এটাই ভাল থাকা। সব সময়ের জন্য নিজের প্রতি আস্থা(

নিজেকে সম্মান(আত্মানন্দে অন্যের সঙ্গে, প্রয়োজনে একাই, সার্বিক কল্যাণসাধনা। একেই তো ভাল থাকা বলে। আমরা এই জীবনের দিনযাপনের একটা কাঠামো তৈরি করতে পেরেছি, আমাদের বন্ধুরা এইমত কাজ করে চলেছেন স্বদেশ বিদেশ অর্থাৎ এই ভুবনে, তাদের কাজ কর্ম প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি মিলিয়ে একটা সংক্ষি প্ত জীবনচর্চার ভাষ্য তৈরি করতে পেরেছি সেটি এবার পেশ করব। পাঠক নিজের মত করেই একে পরিমার্জন করে নেবেন।

রাতে ঘুমোবার সময়

নিদ্রাস্নান - যে কোন শুভ চিন্তা যা আপনার পক্ষে স্নিগ্ধ, তাকে জলের মত চিন্তার '*দেহে*' ঢালা। এটি রবীন্দ্রনাথ করতেন। সব চিন্তা ছাপিয়ে ধারার মত বইয়ে দিন আপনার শ্রেয় চিন্তাটি। একেই বলে নিদ্রাস্নান। শোবেন খোলা জায়গায়, যাতে বাইরের বাতাস ঢুকতে পারে। ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে মাথা-গলা (নাক খোলা রেখে) হালকা কাপড়ে ঢেকে রাখবেন, পরে তার আর দরকার লাগবে না।

সকালে শয্যাত্যাগের আগে

দেহচর্চা - মাথার বালিস সরিয়ে নিন, শবাসনে শুয়ে থাকুন, এবার দুটো হাত দুটো পা, ঐ শোয়া অবস্থাতেই রেখে মুঠি খুলুন মুঠ করুন, সারা শরীরে রক্তসঞ্চালনের পথ। মিনিট দুই-তিন করলেই যথেষ্ট। এবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন, শবাসনেই, মিনিট তিন-চার এভাবে থাকুন, মেরুদণ্ড সুস্থ রাখার সহজ উপায়। ফিরে আসুন চিৎ-হয়ে শবাসনে। দুটো পা ভাঁজ করে পেটের সঙ্গে চেপে ধরুন। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখবেন। মিনিট দুই মত থাকুন, পেটের সঞ্চিত বায়ু বার হয়ে যাবে, ঢুকবে সকালের তাজা বায়ু। পেট, মেরুদন্ড, আর সারা দেহে রক্তপ্রবাহ এবং তাজা বাতাস সুস্থভাবে কাজ করতে লাগলে দেহযন্ত্রের বাকি অঞ্চলগুলো এমনিতেই কাজে উদ্যম পাবে।

চিত্তশুদ্ধি - এবার মনের দিকে তাকান। রাতের নিদ্রাস্নান এমনিতেই আপনার মনে শান্তি এনে দিয়েছে, এবার শুরু করুন প্রত্যাহার-যোগ। মনে মনে নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলো যা যা উঠে আসছে তা বলতে থাকুন। উঠে আসা চিন্তাদের থামাবেন না, স্রেফ তাদের দিকে তাকান, তারা কে কি করছে কি বলছে সেটির দিকে নজর রাখুন, নিজেকে বলতে থাকুন। মিনিট দু-তিন বাদেই দেখবেন চিন্তা দুশ্চিন্তা সব আপনার প্রশ্রয় না পেয়ে থমকে গেছে। এবার আপনি আপনার আজকের দিনের কাজকর্তব্য ভেবে ফেলুন, তা কত সহজে কত উপকারে লাগাতে পারবেন তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে শয্যাত্যাগ করুন।

প্রাতঃকর্ম

সম্ভবমত, শয্যাত্যাগ না করেই, দেড়-দু লিটার জল খেয়ে নিন (একদিনে না হতে পারে, চেষ্টা করলে তা হয়ে যাবে - এটি জলযোগের সহজ আচার)। বিছানাটি পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলুন। ঘরের ঝুলধুলোময়লা ঝেড়ে ফেলুন। মনে মনে কোন মন্ত্র, কোন সংগীত, কোন প্রার্থনা করতেই পারেন। কিছু যদি নাও করেন, প্রত্যাহার-যোগটি কিন্তু করতে করতেই কাজগুলো সারবেন। নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসের চলনটি দেখতে থাকাও একটা বড় ক্রিয়া। আর তা সবসময়ই করা যায়। খুব উত্তেজনার সময় যদি ঝট করে নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াটি দেখতে থাকেন ও তাকে ছন্দোময় করতে চান (উত্তেজনার সময় দেখবেন শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি অনিয়মিত হয়ে উঠেছে, আপনি তাকে নিয়মিত করতে চাইলেই, ধরা যাক, যদি দশ সেকেন্ডে শ্বাস নেন তাহলে দশ সেকেন্ড ধরে শ্বাস ছাড়বেন - এটাই) তাহলেই দেখবেন আপনি শান্ত হয়ে উঠেছেন। এইভাবে চলতে চলতে সকালের প্রথম সময়টা কাটান। এরপর মুখ ধুতে পারেন, চা খেতে পারেন, তুলসীর শুখা পাতা মঞ্জরী খুবই স্বাদু 'চা'পাতার কাজ করে। দেড়-দু লিটার জলের চাপে কোষ্ঠ আপনা হতেই পরিষ্কার হবে। শুদ্ধ জীবন যাপনের সঙ্গে দেহের অশুদ্ধ ময়লা ত্যাগ করার একটি সম্বন্ধ রয়েছে। তাই কোষ্ঠ পরিষ্কার একটি বড় ক্রিয়া আর তা জলের সাহায্যে এবং আঁশযুক্ত খাবার খেলে এমনিতেই সারা যায়।

ঈশ্বর চিন্তা

কাকে বলব ঈশ্বর? সে তো আমিই। আমার মধ্যে যে নির্ভীক সত্যটা রয়েছে তাই তো ঈশ্বর। আর তাতে মগ্ন হবো কি করে যদি না আমার সততার প্রতি আমার বিশ্বাস থাকে? আর সেই সত্যের পরিচয় আপনারআমার কাছে অহরহ আসছে। প্রতি মুহূর্ত আপনার কাছে কি পরীক্ষা হয়ে আসছে না যাকে সহজ সুন্দর শুভ শান্ত করার পরীক্ষায় আপনাকে নামতে হচ্ছেই? ঐটিই আপনার ঈশ্বরসান্নিধ্য। তাই এই সময় এই মুহূর্ত আপনার কাছে সহজ সুন্দর শান্ত শুভ হবার পরীক্ষা নিতে তথা আপনাকে আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করতে আপনাকে আহ্বান করছে, না করে আপনি পার পাবেন না কোনোদিনও। এটিই আপনার সত্যচর্চা সত্যধ্যান। কাজ আপনাকে করতে হবেই আর কাজের প্রতি পজেটিভ আউটলুক না থাকলে কাজ করবেন কি করে? আবার সব কাজ যে আপনার খুশিমত হবে তাও কিন্তু নয়। ধরা যাক, প্রিয়জনের কোন মারাত্মক অসুখ হয়েছে - এ কি আনন্দজনক? তখনি তা দুঃখোদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে, পজেটিভ আউটলুকসম্পন্ন হয়ে উঠবে যদি মনে ভাবেন এই পরীক্ষায় আপনাকে টানা হয়েছে, দৃঢ়চিত্তে তার মধ্যেকার সত্যটি আপনাকে খুঁজে ও বুঝে নিতে হবে। বহু দুঃখ পাওয়া রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের একটি মন্ত্র বারবার সকলকে বলতেন - সুখ কি দুঃখ, চাই বা না চাই, যাই পাই না কেন, অপরাজিত হৃদয়ে তা বরণ করে নিতে হবে। এটাই পজেটিভ আউটলুক।

খাদ্যবিধি

আমরা তিনটে খাবারের ওপর জোর দিচ্ছি। একটা পানীয় - ছাতুর শরবতের মতই। নতুনত্ব হলো এতে গোটা মুগ বা ছোলা বা যবের শিকড় বার করে নিয়ে তাকে রোদে শুকিয়ে মিহি করে বেটে জারে রেখে দেয়া। স্বাস্থ্যপানীয় হিসেবে এ অদ্বিতীয়।

অন্যটা হলো, মিহি করে বাটাবুটির ঝামেলা এড়াতে স্রেফ ছোলা কি যব এক রাত্রি জলে ভিজিয়ে পরের দুদিন মত তাকে জল ছাড়া রাখলে তা থেকে শিকড় জন্মায় অর্থাৎ তাতেপ্রাণের সঞ্চার ঘটে। তাকে পৃথিবীর আলো দেখাবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি তাতে এনে দিয়েছে দুষ্প্রাপ্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট। তাকে আমাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। একই সঙ্গে একটি-দুটি খোসাওলা আলু আর ঐ কলতোলা ছোলাযব সেদ্ধ করে বিট বা সৈন্ধব লবণ দিয়ে প্রয়োজনে গোলমরিচ ইত্যাদি যা অভিরুচি (আলুর খোসা ছাড়িয়ে) যোগ করে খাওয়া যায়। ওটা একটা পরিপূর্ণ খাবার। গোটা মুগে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই শেকড় আসে এবং মুগটি সহজপাচ্যও তাই এই খাবারটিকে প্রায়োরিটি দেয়া যেতে পারে।

আর তৃতীয় খাদ্যটি হলো খিচুড়ি। সামান্য একটু, বৈজ্ঞানিক বলব না, ঐতিহ্যিক নিয়ম মেনে এই খাবারটি সস্তায় বানানো যায় তা পুষ্টিকর সহজপাচ্যও। ক. চাল নিন, চালের সঙ্গে যে কোন মিলেট জাতীয় খাবার যথা জোয়ার ভুট্টা বাজরা রাগী দালিয়া যা মন চায় নিন। যতটা নেবেন তার একের তিন মাত্রার ডাল নিন, ডাল পাঁচমিশেলি হলেই ভাল। খ. এবার যোগ করুন ডাল ও চালের দ্বিগুণ মাপের শাকসব্জি - সময়ে যা ফলে তাই। এতে যা আপনাকে দিতেই হবে তা হলো - এক, নারকেল, যা কুড়ে দিতে পারলে বাড়তি তেল দেবার ঝঞ্ঝাট থাকে না(দুই, সময়ের শাক, তিনটে শাকের একটা, যা সেই সময়ে জন্মায়, যারা হলো নটে বা কলমি বা পালং - এদের দিতেই হবে। এই মিশ্রণটি খিচুড়ি করে খাওয়া যেতে পারে। আলাদা আলাদা করে রেঁধে খাওয়া যেতে পারে। একবেলা এই খাবারের জন্যে খরচ পাঁচ থেকে ছ টাকা। যারা বিত্তবান তারা যদি একবেলা এই খাবারটি খান তাহলে মাসে পাঁচছশো টাকা সঞ্চয় হয়ে যায় যা খাবারের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার ফলে নষ্ট হচ্ছিল। এই টাকাটি দিয়ে একটি অ্যাফ্লুয়েন্ট পরিবার যদি একটি নিঃস্ব পরিবারের কল্যাণে ব্যয় কি লগ্নী করেন তাহলে তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় দারিদ্র্য দূর হয়ে গেছে (যদি ধরে নিই দেশের পঞ্চাশ ভাগ ওপরে, পঞ্চাশ ভাগ নিচে)।

এই সঙ্গে দুধের কথাটিও বলা দরকার। ঐতিহ্যিক মতে, মাছ মাংস না খেলেও চলবে, কিন্তু দুধ, বিশেষত ছাগলের দুধ খাওয়াটা সুস্বাস্থ্যের একান্ত শর্ত। ছাগল পোষা খুব একটা শক্ত কাজ নয়। গ্রামদেশে তো তা করাই যায়। শহরে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমরা, শহুরে, সর্বোপরি ফ্ল্যাটবাসিন্দেরা, যদি কুকুর পালতে পারি ছাগল কেন পালতে পারব না। রবীন্দ্রনাথ বোলপুরের রূক্ষ মাটির কথা বিবেচনা করে উট পুষতে চেয়েছিলেন, ভারবাহী এই জীবটির দুধও স্বাদু তাই ঐ ভাবনা।

পথ চলতে চলতে

প্রত্যাহারে থাকুন। বাইরের চিন্তা মনে ঢুকতে দেবেন না। দেখবেন আপনার চিন্তাটিই আপনাকে অধিকার করে নেবে। নিজের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কিভাবে চলছে স্রেফ সেটাই দেখতে থাকুন। নিজেকে বন্ধু ভাবুন, নিজের প্রতি আস্থা রাখুন, সহজ সহজ কাজ রাখুন। দেখবেন একটু একটু করেই পারছেন তা করতে।

জীবিকা ক্ষেত্রে

আপনার কাজ অন্য একজনের উপকারে নিশ্চয় লাগছে। স্রেফ এটিই যদি মনে রাখতে পারেন, দেখবেন, কাজ করতে কোনই বাধা আসছে না, বরং কাজ করতে ভালই লাগছে, গতানুগতিক কাজের বিরক্তি কেটে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে, শুধু মনে রাখাই বা বলি কেন, এই তো সত্য যে আপনি যে কাজ করছেন তা কারো না কারোর উপকারে লাগছে।

নিত্যকর্ম

দাঁত মাজা - শুধু আদা দিয়ে দাঁত মাজা যায়। মাজা যায় নিমডাল, পেয়ারাডাল দিয়ে। ত্রিফলা চূর্ণ ব্যবহার করা যায়। সম পরিমাণ খাবার-সোডা আর নুন মিশিয়ে মাজন করা যায়। *সাবান* - এমনিতে সাবান ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই, শুধু খাবার আগে ও শৌচকর্মে হাত সাবান দিয়ে ধোয়া অবশ্য কর্তব্য। দেহমার্জনার জন্য সপ্তাহে একদিন একটি হরতুকি একটি বহেরা ও একটি আমলকি ভাল করে ধুয়ে (আগের রাতে) বড় গ্লাস জলে ভিজিয়ে রাখবেন। সেই জলের তিনের চার ভাগ সকালে খেয়ে নিন, বাকিটা ভাল করে মাথা থেকে পা অব্দি মাখুন (এই জল চোখ ভাল রাখতেও অদ্বিতীয়)। সারা শরীরে হত্তুকি-বহেরা-আমলার ক্কাথটা ডলে ডলে মাখুন। তারপর স্নান করে নিন। ওটাই সাবান। আরেকটি সাবান আছে - খান দশেক নিমপাতা এক কাপ জলে ফেলে ফুটিয়ে তাকে আধ কাপে নিয়ে আসুন, তাতে পরিমাণ মতো কাঁচা হলুদ বেটে দিন। ঐ ক্কাথটি গায়ে মাখুন, চামড়া পরিষ্কার করতে রোগমুক্ত করতে এইই ভাল দাওয়াই। দিনে আপনার এই দুটি জিনিসই বেশি লাগে। বাকি জিনিসপত্র সম্বন্ধে আমরা কিছু পরে লিখছি।

প্রকৃতি সেবা

বাড়ির বারান্দায় একমুঠো করে চালগম রোজ ছড়িয়ে দিন। পাখির মেলা বসে যাবে। বারান্দার এককোণে পাখিদের বাসা বানিয়ে দিন - দুচারটে হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিলেই যথেষ্ট আর এ মাথা থেকে ও মাথা বরাবর দুটো রড রাখুন, পাখিরা রাতবিরেতে আশ্রয় নেবে, বর্ষাবাদলা থেকে রেহাই পাবে, হাঁড়িতে ডিম পাড়বে। দুটো চোদ্দো ইঞ্চি গভীরতার টবে একটায় গন্ধরাজ, অন্যটায় মার্লবেরি বসিয়ে দিন। মার্লবেরি ফল আর গন্ধরাজ ফুলের স্বাদ নিতে রাজ্যের পাখি জড়ো হবে। দেখতে দেখতে আসবে রঙবেরঙের প্রজাপতি মৌমাছি ভোমরার দল। আপনি ঘরে বসেই প্রাকৃতিক যজ্ঞ শুরু করতে পারেন, প্রায় নিখরচায়।

যে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, মাথার ওপর আর পায়ের নিচে , কার্যত আমাদের ঘিরে রয়েছে যে প্রকৃতি, যার স্নেহ সাহচর্যই আমাদের যা কিছু পাওয়ার তা পাওয়াচ্ছে, যা কিছু নেবার ঠিক মাপেই নিয়ে নিচ্ছে - তাকে বন্দনা করা আমার কাজ আর তা করতে হবে নিত্য। কাজগুলো হলো -

মাটিকে সজীব রাখা
জলকে ধরে রাখা, সুব্যবহার করা
হাওয়াকে কাজে লাগানো
রোদকে অন্তত গাছ দিয়ে প্রাণোপযোগী ক্ষে ত্রময় করে তোলা
যেন দিনের কিছুটা সময় খোলা আকাশের নিচে থাকতে পারি সেটি বজায় রাখা।

সামাজিকতা

আপনার ঘরে যে বাসন মাজতে রান্না করতে এসেছে(কি, যে মাসির কাছ থেকে আপনি আনাজপাতি কিনছেন(বা, যে রিক্সায় আপনি চড়ে থাকেন তার চালককে নিয়েই আপনি মহাভারত পাঠ করতে করতেই ওপরের কথাগুলো শোনাতে পারেন, একবেলা তার সঙ্গে সহজ-আহার করতেই পারেন। সমাজসেবা করতে হলে গ্রামে যেতে হবে তা কেন, আপনার ঘরেই কি অনালোকিত ঘরের মানুষজন পরীক্ষা হয়ে আসছে না ? আসছেই। তাদের নিয়েই এই সহজে ভাল থাকার পরীক্ষাটি করা যেতে পারে। এরপর পারেন তার জীবনবিমার প্রিমিয়াম দিতে কি তার জন্যে মেডিক্লেম করতে - এককালীন টাকাটা আপনিই নাহয় দিলেন, সে বা তারা মাসে মাসে সাধ্যমত শোধ দিক এমন শর্তে আপনি পারেনই তা করতে। আর সমাজের জন্যে প্রত্যক্ষ সেবায় নামতে হলে নানা ঝক্কির মধ্যে এটি অন্যতম যে, যেভাবে হোক, বদনাম আপনার লাগবেই! তো ছোট ছোট বদনাম দিয়েই শুরু করুন না কেন!

নাগরিক অধিকার

সমাজ-স্বীকৃত নাগরিক অধিকারগুলি ব্যক্তি তার জীবনে প্রয়োগ করতে পারে। সে মেডিক্লেম করতে পারে, জীবনবিমা করতে পারে। জীবিকাকেন্দ্রিক পাওয়া ও দেওয়া - দুটোতেই সে নিষ্ঠাবান থাকতে পারে। একই সঙ্গে প্রকৃতি-নির্ভর পথটি সে অনুসরণ করবে। তিন, এই দুটি উদ্যোগের কথা সে বাইরে বলবে।

বাজার-অর্থনীতি-যজ্ঞে সে কি ভূমিকা নেবে বা তাকে আদৌ কোন ভূমিকা পালন করতে আহ্বান করা হবে কি বাধ্য করা হবে এটা সম্পূর্ণ পরিস্থিতি-নির্ভর প্রশ্ন। কিন্তু এটা ঠিক যে, পরীক্ষা করেই শিখেছি, আত্মশক্তির প্রতি আস্থা পরিস্থিতিকে সহনীয় কখনো নমনীয় করে তোলে। আমি যদি মৃত্যুভয় কাটাতে পারি, যে কোন মুহূর্তকে শিক্ষণীয় মনে করে অম্লান-চিত্তে সামনে দাঁড়াতে পারি তাহলে, যে বিপদ আসার তা আমি চাই বা না চাই সে তো আসছেই, কিন্তু আমার নির্ভীক মোকাবিলা পরিস্থিতির চাপকে সহনীয় করে তুলতে পারে। বহু দৃষ্টান্তই এক্ষে ত্রে দেওয়া যায়।

অতঃপর

সব্জিবাগান করা যায়। যা করা কিছুটা শ্রমসাপেক্ষ । কিন্তু অসহজ নয়। আরেকটি কাজ হলো, দুটো টবে বাসক তুলসি থানকুনি পুনর্নবা কালমেঘ দূর্বা গাঁদাল লাগানো। এরা সারা বছরের ছোটখাট রোগব্যাধি সারাবার দেশজ দাওয়াই। গৃহজাত ময়লা সুব্যবহার করা যায়। আনাজের ফেলে দেয়া অংশ দিয়ে (আমিষ যেন বাদ থাকে - আমিষ রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে গাছের সার হিসেবে পৃথক করে ব্যবহার করা যেতে পারে) কেঁচোর চাষ করা যায়। তাতে গোবরজল গুলে দিয়ে পচিয়ে গোবর সার করা যায়। করাটা একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। কারণ এ দেশের মাটি অত্যধিক রাসায়নিক সার পেয়ে এমনিতে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাটিকে শুদ্ধ না করতে পারলে মাটিজাত সব কিছুই বিষিয়ে যাচ্ছে যাবে। এখনি আমাদের একেকজনকে এমনি এমনি কাজেই আসতে হবে।

সপরিবারে

বাড়ির ছোটরা - এই এই কাজে অংশ নিতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়ে থাকে, তাদের একাজে জুড়লে ভাবী সামাজিক মানুষের অভাব ঘটবে না।
দাম্পত্য জীবনে - অন্তত দশ মিনিট চিত্তশুদ্ধি নিয়ে আলাপ করুন। যাকে বলি চিন্তাশীল পুস্তক - মহাভারতই যথেষ্ট - তা পাঠ আলোচনা করুন।

বয়োজ্যেষ্ঠদের - বয়স্ক মানুষদের ওপরে বর্ণিত কাজে জড়িয়ে দিন, তারা দায়িত্ব পেয়ে মূল্যহীনতায় ভুগবেন না।

মত বিনিময়

এই যে কাজগুলি আমি করছি যা এমন একটা কিছু বেশি সময়ের কাজও নয় - এই যে প্রকৃতিকে সংসারকে নাগরিকতাকে শ্রীময় করার কাজ করছি - এদের কথা এবার নিঃসংকোচেই বলতে পারি -

পড়শিদের
গৃহকর্মিদের
জীবিকাক্ষে ত্রের বন্ধুদের
অন্য অন্য আত্মীয়বন্ধুদের
এবং নিজেকে - অন্তত ঘণ্টা পিছু পাঁচ মিনিট একবার করে এই কথাটি স্মরণ করা যে আমি পেরেছি আমি পারবও।

আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেত

নিজেকে দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করতে হবে। এবার আপনার সুপ্ত স্বপ্নকে বাস্তব জমিতে বপন করুন। আপনি পারবেনই। অবসাদ যে আসে না তা তো নয়, নানা ধরনের মানুষ তাদের নানা স্বার্থের জাল বিছিয়ে সবাইকে বাঁধতে চায়, এই বন্ধন আনে অবসাদ, কিন্তু তাকে কাটাতে হবেই। নিজেকে দৃঢ়ভাবে জানাতে হবেই যে আপনি সামান্য হলেও পারছেন - তাই কিসের অবসাদ। নিত্য শুদ্ধ কর্ম ও শুদ্ধ সঙ্গ পারবে অবসাদ কাটাতে। পুনরায় বলি, আপনি এভাবে চললে চারটি গাছ, অগণিত মৌমাছি প্রজাপতিদের সাথী করে মহাজীবনকেই শুভময় করবে। পঞ্চাশটি পাখি প্রকৃতিকে নন্দিত করবে। দুটি মানব পরিবার আলোকপ্রাপ্ত হবে। প্রায় কিছু ব্যয় না করে স্রেফ সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে আমি যদি এই ভালটুকু করতে পারি তাহলে তা করি না কেন। শেষ করব ভগবদ্গীতার একটি ভাষ্য দিয়ে - যজ্ঞ থেকে মেঘ হয়, মেঘ থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রাণী হয়। আবার যজ্ঞ কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়, কর্ম আসে ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্ম পরমাত্মা অক্ষ র থেকে উদ্ভূত। অতএব সর্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞ এইভাবেই ঘর থেকে সারা ভুবনে ছড়িয়ে যায় আর তার রেশ থাকে বলেই জীবন এখনো সুন্দর।

২

দ্বিতীয় ভাবনা - সমিতির দায়িত্ব

উঠবে সমিতির কথা। ভীত ত্রস্ত মানুষের ভয় কাটাতে সমিতির ভূমিকা অপরিসীম। এর সাথে এ কথাও বলা যায় যে, এখনকার আন্দোলনের কথা উঠুক কি বাজার বিস্তারের কথা উঠুক - এন জি ও একটি বিকল্প পথ, সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী পথ। সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা টাকা আত্মসাৎ করার জন্য এন জি ও করছে। কিছু এন জি ও আছে যারা ভাবছে এক, কিন্তু অন্য পথে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ফান্ডিং এজেন্সির চাপে। কিছু এন জি ও আছে যারা টাকা তছরূপ করছে না, কিন্তু এই খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয় করছে ইত্যাদি। কিছু এন জি ও আছে যারা সততার সঙ্গে নিষ্ঠা রেখেই কাজ করতে চাইছে। কাজের কাজ কিন্তু ঐ দিক ধরেই যে দিকের কথা নিয়ে বর্তমান পুস্তকটি গড়া। আমরা একটি সংগঠনোপযোগী পন্থা নির্দেশ করতে চাইছি। আমাদের এন জি ও-করা বন্ধুরা নিজের মতন করে সংযোজন পরিমার্জন করে নেবেন।

নিঃস্বমানুষের সমাজে পৌছনো

অবস্থাটা সত্যিই অন্যরকম হয় নিঃস্বজনের ক্ষে ত্রে। সেইসব মানুষ যাদের রুজিরোজগার হয়ত ফুটপাথে, কি যারা থাকেন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেমন, ধরা যাক, ছোট আঙরিয়া কি কুসমাশুলিতে। তাদের সম্বল হলো ভয়। তারা ভয় পায়। পার্টিকে ভয় পায়, ওঝাকে ভয় পায়, উঠতে বসতে ঘর জ্বলবার নির্যাতিত হবার ভয় পায়। এমন সব মানুষদের সঙ্গে আলোচনায় পেয়েছি আরো কয়েকটি শর্ত, শুদ্ধ জীবনযাপনের শর্ত। যারা হলো -

১. সমিতি - নন্ প্রফিট কি নন্ গভর্নমেন্ট কি ভলান্টারি অর্গানাইজেশন - যা হোক না কেন, সমিতি থাকা দরকার। সমিতি যত সৎ থাকবে সমিতিবদ্ধ মানুষেরা তত সাহসী হয়ে উঠবেন।

২. সমিতিই পারবে মাইক্রোফিনান্সের গাঁটছড়া বেঁধে দিতে। নিঃস্বমানুষের কাছে অর্থের একমাত্র জোগানদার ঐ ব্যবস্থা (যার কার্যকারণ নিয়ে শ্রয়ণ ইতিপূর্বেই কাজ করেছে)।

৩. সমিতিকর্ম - এমন কিছু কাজ আছে যা সাধারণত মানুষজন করে উঠতে পারেন না, তা করা সমিতির দায়। অধিকাংশ সমিতি কোন না কোন ভাবে বিশ্ববাজারের কোন না কোন ফান্ডিং এজেন্সির দ্বারা অর্থসহায়তা পান - তাই এটা সমিতির দায়িত্ব যে, তার সদস্যদের সে কি কি কাজ দেবে, কিসে কিসে ট্রেইন করাবে, কি কি উৎপাদন করাবে ও কোন বাজারে তা বেচবে। যাদের বাজারমূল্য আছে এবং বাজারে তা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ঐ সমিতিরই। অধিকাংশ সমিতি এই কাজটি করে উঠতে পারে না। অথচ তার এই দুটো দিকই দেখা দরকার। বাজার যা চাইছে তা

জোগান দেয়া, সদস্যদের সেইমত কাজ দেওয়া। সদস্যদের শেলাই শেখালাম - সেটাই একমাত্র কাজ নয়, শেলাই শেখবার পর সে যা তৈরি করবে সেটি বাজারে নিয়ে যাওয়া বিক্রির ব্যবস্থা করা সমিতির দায়। এ নিয়ে ভাবার দরকার আছে। দ্বিতীয় কাজটি হলো - সদস্যেরা মা-প্রকৃতির দান কতটা কাজে লাগিয়ে নিজেকে ও সমাজকে সুস্থ রাখতে পারে সেই সংক্রান্ত জ্ঞান (অতি সামান্যই অর্থ তাতে ব্যয়িত হয়) শিক্ষা পরামর্শ দেবে সমিতি। কি সেই শিক্ষা তা নিয়েই এই গ্রন্থের আয়োজন।

সমিতিসংগঠনের শিক্ষাকর্ম

প্রথমত, সংগঠন তার সদস্যদের মধ্যে সহজ জীবনের জন্য যা করণীয় (যা ব্যক্তির কাজ হিসেবে একটু আগেই বলা হয়েছে) তা অনুসরণ করতে বলবেন। এবং এক ও এক অনুপাত ধরে একজন সদস্য পিছু একটি নিঃস্ব পরিবার - এমন উদ্যোগ নিতে বলবেন। সংগঠন হিসেবে তাদের কয়েকটি বাড়তি কাজ থাকবে কিন্তু মূল কাজ এইটাই। পঞ্চায়েত একই ভাবে চলতে পারে (আমরা শীঘ্রই বিশ্ব ব্যাঙ্ককে এই পথটি সম্বন্ধে অবহিত করতে চলেছি। পাঠককে জানিয়ে রাখি, রাষ্ট্রের অর্থনীতি যেমন নির্ধারণ করে বিশ্ব ব্যাঙ্ক তেমনি ডিসেন্ট্রালাইজেশনের কাজকর্মটিও আজকাল ঠিক করছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোতে যতই প্রভাবশালী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা থাকুন না কেন, দেয়ালে শোরগোল ফেলা যতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘেউঘেউ উঠুক না কেন, কাজী কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্কই)। এভাবে চলতে চাওয়াটা যদি কোন ফান্ডিং এজেন্সি অস্বীকার করেন তাহলে সেই এজেন্সিকে অগ্রাহ্য করার মত সাহস যেন থাকে সেটি দেখতে হবে। বাড়তি যে যে কাজ সাংগঠনিক ভাবে সারতে হয় তা হলো - যথাসাধ্য ওপরনিচের যোগসূত্রতা স্থাপন, এবং প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করা। অবশ্যই এসবের মূল কথাটি এই যে, নির্মাণকর্ম না থাকলে গোটা ব্যাপারটাই অর্থহীন।

সংগঠন হিসেবে -

নিরাপত্তার দিকটি - পার্টি পুলিশ প্রশাসন - এর সঙ্গে সৎ সম্পর্ক রাখা(

মাইক্রোফিনান্স কর্মযজ্ঞটি চালু করা (কিন্তু যেন সেলফোনের ব্যবসা নিয়েই না মেতে থাকি তা খেয়াল রাখতে হবে!)(

যথাসাধ্য ওপরতলার সঙ্গে নিচতলার যোগাযোগ সততার সঙ্গে বজায় রাখা(

বাজার-অর্থনীতির সদর্থ প্রয়োগ, একই সঙ্গে সদস্যদের মধ্যে বার্টার-অর্থচক্র চালু করা, একের শ্রমজ দ্রব্য অন্যের আরেক শ্রমজ দ্রব্যের সঙ্গে বদলাবদলি করে নেয়া, টাইম-ডলার নিয়ে একটি লেখা এখানে রয়েছে যা ঐ বার্টার-প্রথায় আশ্রিত(

সংগঠনের কর্মী ও কর্মক্ষেত্রের আওতায় আসা মানুষজনের জন্য ইনস্যুরেন্স চালু করা(

একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র - যা যুগপৎ হোমিও বায়ো ও অ্যালোপ্যাথিক মতেই চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা(

নিকটস্থ হাসপাতালের সঙ্গে টাই-আপ রাখা, মেডিক্লেম মারফৎ বিমা করিয়েই সেবার ব্যবস্থা রাখা(

বিশেষত নিরাপত্তার দিকটি খেয়াল রেখে কাজ করা, কারণ আকচার ঘটা অসামাজিক কর্মের মধ্যে রয়েছে স্ত্রী-নির্যাতন, নারী-পাচার, নেশা পানির ব্যবসা, অবৈধ ব্যবসা।

প্রশাসনের সঙ্গে সর্বোপরি ওপরতলার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে এসব ঠেকানো সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সমিতির কর্তা কর্মী সদস্য - সবার মধ্যে সহজ জীবনের - সাড়ে তিন হাত জমিকে কত সহজে তৃপ্ত রাখা যায় - সেটি শেখা শেখানো চর্চা করা দরকার। নিজে করা অন্যদের করতে বলা।

সংগঠনের একটা চাপা অশান্তি থাকেই। ওদিকে ফান্ডের টাকা নিয়মিত আসাটা অব্যাহত আছে কি না সেটায় সতর্ক থাকতে হয়। এদিকে সংগঠনের কর্মীরা নিয়মিত মাইনে পাচ্ছে কিনা(মাইনে তো সরকারি কর্মিদের থেকে ঢেরই কম, তাই একজন সৎ কর্মী যিনি কাজ করতে ভালবাসেন তেমন কর্মীরও সংসারে টানাটানি থাকলে মন কি ভাল থাকতে পারে - এটি সৎ সংগঠকদের অস্বস্তিতে রাখে সবসময়ই। তাই নিজেরটা নিজে করে নেয়াটি শিখতে হয়। কার্যত ওটাই শেখার শেখাবার। তাই সংগঠনটি নিজেদের মধ্যে অন্তত টাইম-ডলার-মাফিক বিনিময় দ্রব্যনীতি চালু করতে পারে, তাতে কর্তা ও কর্মীর ভেদও ঘুচে যেতে পারে, কম অর্থে বাঁচার যজ্ঞটি পথ পেতে পারে।

৩

তৃতীয় ভাবনা - সহজে আরো কিছু পাওয়া

যা দিয়ে দিনের কাজ চলে যাচ্ছে, সহজে মিটছে, সেইসব দ্রব্যাদি কিভাবে কম খরচে তৈরি করা যায়, রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তার কথা ভাবব। ভাবার কারণ হলো, বাজার-অর্থনীতি-নির্ভর জীবনযাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকলে যা যা দরকার তা পেতে হলে টাকা খরচ করতে হবে। টাকা না থাকলে কিছুই কেনা যাবে না। এভাবে চললে, জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়বে, এবং টাকাপয়সার ঘাটতি থাকলে বাঁচার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনতে নাও পারতে পারি। শুধু কি তাই, অন্যের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে অসুন্দর জীবন কাটাতে হতেও পারে। যেমনটি

লক্ষ করেছেন স্থপতিবিদ বন্ধু পার্থ দাস, শহরের বস্তিবাড়িগুলি অসুন্দর কারণ সেখানকার বাসিন্দারা শহরের ফেলে দেয়া টিন পলিথিন অ্যাসবেস্টস কাঠকুটো যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে পাচ্ছে তা যেখানেসেখানে গুঁজতে গুঁজতে ঘরটা অসুন্দর হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেই মানুষগুলো, তাদের অরিজিন তো গ্রামই, জীবিকার প্রয়োজনে শহরে তাদের আসা, তাই তাদের ট্রাডিশনাল মাটির বাড়িটি যদি তারা করতে পারত সেটা তারা সুন্দর করেই করত। যথাসম্ভব তাই, বাজার-অর্থব্যবসার মধ্যেই, তাকে একটু একটু করে উপেক্ষা করার সাহস অর্জন করা দরকার। বাজার অর্থনীতি বা টাকা-নির্ভর অর্থনীতির বিকল্প হলো স্বনির্ভর সমাজনীতি, যেখানে রসদের জোগানদার, টাকার বদলে, প্রকৃতি নিজেই। প্রকৃতির রোদ জল মাটি হাওয়া আকাশকে কাজে লাগিয়ে সুস্থভাবে বাঁচার দুনিয়া নির্মাণ করা - এবং সেটা এই হত্যাজর্জর সাম্রাজ্যবিস্তারের মধ্যেই সম্ভবপর করে তুলতে হবে। এর জন্য চাই বিজ্ঞানবোধ ও যথাসাধ্য নির্লোভ দিন যাপনাকাঙক্ষা মেধা। কিভাবে রোদকে সঞ্চয় করব? কিভাবে জলকে ধরব? ইত্যাদি বিষয়গুলোর সুপরিকল্পিত উদ্যোগ সফল হতে চাই বিজ্ঞানবোধ। এ ধরনের কাজ হয়েও চলেছে। সবার আগে দরকার লোভ কমানো - যা গান্ধি বলতেন(অধুনা সব ধরনের পরিবেশবিদ, প্রতিষ্ঠান তার পুনরুক্তি করছেন। সব মানুষের ভালভাবে বাঁচার জন্যে প্রকৃতিতে রয়েছে যথেষ্টই, কিন্তু একটি মানুষের লোভ নিরসনের জন্যে তার কিছুই নেই। এর জন্যে চাই উদ্যোগ। কমের মধ্যে বাঁচার আনন্দটা - খিদের চাটনি দিয়ে খাবার খাওয়ার মজাটা পেতে হবে। সম্ভাব্য দিনযাপনের চিত্রটি এখানে তুলে ধরতে চাইছি।

ঘাস

ঘাসের, সবিশেষ দূর্বার পৌরাণিক উপাখ্যানটি হলো, সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দার পর্বতকে দণ্ড করে বাসুকিকে দড়ি করে সাগরের গভীরে যে অমৃত রয়েছে তাকে তুলে আনার সময় ঘষাঘষির জেরে বিষ্ণুর গায়ের রোম উঠে যায়, ভাসতে ভাসতে তা তীরে এসে ঠেকে, প্রাণ পায় সে দূর্বা-রূপে। বৈদিক সূক্তে দেখা যায় সূর্যের সঙ্গে দূর্বার যোগসূত্রতা দিয়ে পৃথিবী যে প্রাণময় হয়ে উঠেছে তার মঙ্গলাচরণ। ঘাসের শক্তি নিয়ে আধুনিক ভাবনা এ দেশে করেছেন আন্না হাজারে। ঘাস বাঁচাতে প্রয়োজনে পশুচারণ ভূমিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনার কথা আন্না যে বলেছেন তা এই বইয়ের চতুর্থ পর্বে রয়েছে। এই অতি সাধারণ অতি তুচ্ছ অতি উপেক্ষণীয় অথচ এটিই প্রাণোপযোগী পরিবেশ নির্মাণে তৎপর প্রাণ-এক তার সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা শুনলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে। সম্ভবত পৃথিবীতে প্রথম, অস্ট্রেলিয়ানরা দাবি করছেন ওদের দেশে এক শতাব্দীতে এমন কাজ হয় নি যা হলো ওদের তেরশো প্রজাতির যে সব ঘাস রয়েছে তাদের শনাক্তিকরণ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রিয়া নিয়ে গবেষণা। সাহস করে ওরা বলতে পেরেছেন যে ঘাস হলো অস্ট্রেলিয়ার প্রাকৃত-অর্থনীতির মেরুদণ্ড। এই গবেষণায় যে ফান্ড গড়া হয়েছে তার অঙ্কটিও জানা দরকার - সব মিলিয়ে বারো লাখ ডলার। ঘাস চিনতে ঘাস জানতে। ঘাস যে দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাচ্ছে (কিভাবে - তা জানতে আন্নার বিষয়টি দেখা যায়) তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এই অভিনব উদ্যোগটি একটি সিডি ও বইতে প্রকাশ করাও হয়েছে যা জানতে যোগাযোগ করা যাবে - www.deh.gov.auতে।

উনুন - চুলা

গ্রামোপযোগী পরিবেশে এখানে তা তৈরি করছেন আটঘরা বিকাশ কেন্দ্র। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। শহরে কিছু বন্ধু গ্যাসের নিচের দিকটাকে ব্যবহার করছেন। ওভেনকে একটু উঁচুতে তুলে দিয়ে নিচে যে তাপটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন, নরম আঁচে যা যা গরম করা যেতে পারে তা ঐ নিচের তাপেই করা যায় - বলছেন তারা। পার্থ দাশ পরিকল্পনা করছেন দোতলা উনুন বানাবার। তত্ত্বটা এই - আগুন যতটা ওপরে ওঠে তার তাপ সেখানেই বেশি হয়, মূল রান্নাটা সেই তাপটি নিয়ে হোক, নিচে একটা তাক করা যেতে পারে যেখানে কম আঁচে বা তাত সরাসরি না লাগলেও চলে এমন রান্নাগুলি করা যাবে। এই নিয়ে ভাবনা চলছে।

জ্বালানি

গ্রামে সুবাবুল গাছের কাঠ ভাল জ্বালানির কাজ করে। এছাড়া সর্ষেগাছ দীর্ঘক্ষণ জ্বলতে পারে সে হিসেবে ভাল জ্বালানি হয়ে থাকে। শহরে জ্বালানি অপচয় রোধ করতে পারলে (ওপরের দৃষ্টান্তই ধরা যেতে পারে) যথেষ্ট।

রান্নাপাত্র

কি শহর কি গ্রাম - সোলার কুকার সহজভাবেই কার্যকর হতে পারে। যে সোলার কুকারের মূল্য এক থেকে দু হাজার টাকা, যার স্থায়িত্ব দশ থেকে বিশ বছর - তার সম্বন্ধে তথ্য পাচ্ছি, চার-পাঁচ জনের পরিবারে এমন একটি কুকার বছরে তিন থেকে চারটি গ্যাস সিলিন্ডারের খরচ বাঁচাতে পারে। আরেকটু দামি কুকার, মূল্য যার সাড়ে চার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার হবে, প্যারাবলিক কনসেনট্রেটার কুকার, তা আধ ঘণ্টায় দশ থেকে তেরো লিটার ভাত ডাল সব্জি রেঁধে দিতে পারে। www.indiasolar.com অনুসন্ধান করলে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে খবর পাওয়া যাবে। কথা বলা যায় www.solarshoppe.comএ। কুকারের বৈজ্ঞানিকতা নিয়ে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে ডক্টর অশোক কুন্দাপুরের সঙ্গে http://ashokk-3.tripod.comএ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিশির বন্দ্যোপাধ্যায় (অধুনা প্রয়াত) একটি ইকমিক কুকার তৈরি করতেন যার মূল্য ছিল মাত্র আড়াইশো

টাকা। তার তিন খোপে ভাত ডাল সব্জি এবং বাটি তিনটে আর মূল পাত্রের ব্যবধানে কিছু সেদ্ধ রেখে একযোগে রাঁধা যায়। কোন বন্ধু যদি প্রয়াত অধ্যাপকের কাজটি নিয়ে নব-উদ্যোগে চলতে চান তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন।

বায়ু জল রোদ

রোদ বায়ু ও জল সম্বন্ধে কিছু কথা বলা আছে প্রকৃতি-সমাজ-মনস্কতা পর্বে। রোদকে কাজে লাগানো বলি কি রোদের হাত থেকে রেহাই পাবার কথা বলি, সহজতম উপায় হলো গাছ লাগানো, শুধু যে আনুভূমিক বাগান তাই নয়, প্রয়োজনে খাড়াই বাগান বানানো যায়। গবেষণাপত্রগুলি বলছে এখনো অন্তত পনেরো শতাংশ সৌরশক্তিকে ব্যবহারযোগ্য করছে গাছ। কি গাছ কোন আলোয় কি করতে পারে তা জানতে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ মাইতির সঙ্গে (শ্রয়ণের ঠিকানায়) কথা বলা যেতে পারে। জলের চাষ নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যোগসূত্রতা বজায় রেখে চলেছেন সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, বৈদ্যুতাবাস হলো www.rainwaterharvesting.org.in। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতেই পারে।

মাটি সার গোবর

প্রয়োজনীয় কথা বলা আছে সব্জিবাগান পর্বে। এখানে দুটি বিষয় সংযোজিত হবে। এক হলো কেঁচো চাষ নিয়ে। সার্ভিস সেন্টার কেঁচো সরবরাহ করতে পারেন। মাটিতে সেই কেঁচোদের রেখে বাড়ির (নিরামিষ) ফেলে দেওয়া আনাজপাতি একটু গোবর-ছড়া দিয়ে গুলে পচিয়ে কেঁচোদের উত্তম খাদ্য বানিয়ে তাদের বংশ বিস্তার করানো যায়, করানো দরকারও, কারণ অত্যধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মাটি বিষিয়ে গেছে, এই কেঁচো-ছড়ানো মাইক্রোবিপ্লবই পারবে মাটিকে করুণাময় করে তুলতে। খেয়াল রাখতে হবে কেঁচো যেন আমিষ খাবার না পায়, ওরা আমিষ পছন্দ করে না।

গ্রামের বন্ধুরা গোবর নিয়ে দুটি পরীক্ষা একযোগে করতে পারেন। সাধারণত গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করতে হলে গোবরটি জলে প্রায় পাঁচ দিন মত পচাতে হয় নাহলে গোবর জমাট বাঁধে না। এই প্রথাটিই একটু অন্যভাবে করা যাবে। করেছেনও কেউ কেউ। যে জলে গোবর গোলা হলো, দিন তিনেক বাদে ঐ জলটি সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গবেষণা করে দেখা গেছে ঐ জলে গোবর-পচা-মাটির-মিত্র-জীবাণুরা ভাল মাত্রায় বাড়বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিয়েছে, তাদের মাটিতে ছড়িয়ে দিলে এদিকে যেমন মাটি উর্বর হলো ওদিকে তেমনি ঘুঁটেও জ্বালানি হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেল। শহর আর গ্রাম দুয়ের বন্ধুরা যদি পারস্পরিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন তাহলে আর একটি কাজ করা যেতে পারে। শহরে মশা ও তাকে নিয়ে রমরমা ব্যবসা - কি কয়েলে কি লিকুইডে - যা ক্ষতিকর, কিন্তু হয়ত বা ব্যবসার কারণেই মশা নিধনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগহীনতা আমাদের নাগরিক জীবনে নানা বিপর্যয় ডেকে আনছে। মশা যাবতীয় রোগের একটি সার্থক ভেক্টর - সে যদি খোদ রক্ত পরিবহন চক্রে কামড় বসাতে পারে তাহলে যে কোন ধরনের ব্যাধি যা সে বহন করছে তা মানুষের চলে আসতে পারে। মশা তাড়াবার প্রধান পথ মশারি, কিন্তু তা তো শুধু ঘুমোবার সময়। বাকি সময় মশা জব্দ ঘুঁটের ধোঁয়ায়, নিশিন্দা পাতা নিম পাতা সর্ষের খোল পোড়ানোর গ্যাসে, যারা মানবদেহে ক্ষতি করে না। তো, গ্রাম যদি ঘুঁটে ও ওপরে বর্ণিত পাতাপুতির জোগান দেয়, শহর যদি তা ক্রয় করে - পারস্পরিক শুভ লেনদেন সম্ভবপর হতে পারে।

শহরে গোবর নেই, মাটিও ভাল থাকে না প্রায়শই - মাটি হয় জমাট বেঁধে গেছে, কি লবণের ভাগ বেশি, অথবা কীটনাশক পেয়ে বন্ধ্যা হয়ে গেছে - এইসব ক্ষেত্রে নীরস মাটির সাথে গাছআগাছার পাতা ডাল ইত্যাদি মিশিয়ে কম সময়ে অণুবীজ ও সবুজ সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা যায় ও চাষযোগ্য করা যায়। এটি মহারাষ্ট্রের 'প্রয়োগ পরিবার' সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা পরীক্ষিত, সেটি কলকাতার সর্ভিস সেন্টারের বন্ধুরা প্রচার করছেন পরীক্ষা করতে বলছেন।

সার্ভিস সেন্টার জানাচ্ছেন, প্রথমে ছায়া এলাকায় ১ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১ ফুট প্রস্থ জায়গা বেছে নিন। যে কোন জায়গা এমন কি সিমেন্টের মেঝের ওপরেও করা যায়। যে কোন গাছের কচি বা পরিণত বা শুকনো পাতা সংগ্রহ করে তার মধ্যে থেকে দু-মুঠো পাতা নিয়ে ভাল করে তরল সারে (সব্জিবাগান পর্বে লেখা আছে) বা এক কাপ গোবর মিশ্রিত এক বালতি জলে ডুবিয়ে তুলে নিন। এরপর ঐ ভিজে পাতা না ঝেড়ে ওই ছাওয়া-জায়গায় সমানভাবে বিছিয়ে দিন। এরপর এক আঁজলা মাটি ওই ভিজে পাতার ওপর সমানভাবে বিছিয়ে দিন। আবার শুকনো পাতা তরলসারে কি গোবরমেশানো জলে ডুবিয়ে দ্বিতীয় স্তরের জন্য বিছিয়ে দিন এবং আবার এক আঁজলা মাটি তার ওপর চাপিয়ে দিন। এমন করে তৃতীয় চতুর্থ এইভাবে স্তর স্তর চাপাতে চাপাতে এগারোতম স্তর অবধি করুন। প্রতিটি স্তর তৈরি করার সময় জায়গাটিতে মাটি বা পাতা যাতে সুষমভাবে বেছানো থাকে তার দিকে নজর রাখবেন, নাহলে জায়গাটা ধ্বসে যেতে পারে। দ্বাদশ স্তরে গিয়ে আগেরই মত শুকনো পাতা তরল সারে বা গোবরমিশ্রিত জলে ডুবিয়ে একাদশ স্তরের ওপর বিছিয়ে দেবার পর এক আঁজলা মাটির বদলে দুআঁজলা মাটি বিছিয়ে দিন। ঢিবির উচ্চতা হবে এক ফুট অর্থাৎ প্রতি স্তর এক ইঞ্চি উঁচু হবে। এইভাবে দু সপ্তাহ রেখে দিন। তারপর মাটি ও পাতাকে উল্টেপাল্টে দিন। সাধারণত আলাদা করে জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তরলসার বা গোবরগোলা জলের আর্দ্রতাই যথেষ্ট। তবু যদি দেখা যায় মাটি শুকিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে অল্প জল দিন। এরপর নিজের এলাকার জল-হাওয়ার উপযুক্ত ঘাস তেল ডাল এবং শুঁটি জাতীয় সমস্ত বীজকে মিশিয়ে নিন। মিশ্রিত বীজের এক মুঠো ওই ঢিপির উপরিভাগের মাটির ওপর ছড়িয়ে দিন। বীজ ছড়ানোর পর সামান্য মাটি ছড়িয়ে দিন। বীজ থেকে চারা বেরোনোর এক সপ্তাহ পরে

গাছগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে উল্টেপাল্টে দিন। এইভাবে দু তিন দিন রাখার পর মাটিকে আর একবার উল্টেপাল্টেদিন। আগেরই মত মিশ্রিত বীজের একমুঠো ছড়িয়ে দিন। নতুন চারা গাছে ফুল আসার মুখে চারাগুলোকে কেটে মাটিতে মিশিয়ে দিন। দশ পনেরো দিন পরে ওই নার্সারি সয়েল ব্যবহারের উপযোগী হয়ে উঠবে।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য - মাজন

১. শুধু আদা ব্যবহার করা যায়(
২. নুন আর এক ফোঁটা তেল দিয়ে দাঁত মাজা যায়(
৩. পেয়ারা পাতা/ডাল, ভ্যারাণ্ডা ডাল, নিম ডাল দিয়ে দাঁতন করা যায়(
৪. সম পরিমাণ নুন আর খাবার সোডা মিশিয়ে মাজন করা যায়(
৫. ১০০ গ্রাম গোলমরিচের গুঁড়ো, ১০০ গ্রাম বিট বা সৈন্ধব বা গুঁড়ো নুন আর ১ কেজি মাপের রোদে শুকোনো নিমপাতা গুঁড়ো (আনুপাতিক উপাদান ঠিক রেখে কম বেশি মাত্রায়) ভালভাবে মিশিয়ে পরিষ্কার পাত্রে এটি দীর্ঘদিন রেখে মাজন হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

যে কোন মাজনই মাজার নিয়ম হলো - আঙুলে (বা ব্রাশে) মাজন নিয়ে দাঁতের ওপরনিচ বরাবর মাজা, ব্রাশ ব্যবহার করলেও আঙুল দিয়ে মাড়িকে মালিশ করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ দাঁতের জমিটি হলো মাড়ি, তাকে দৃঢ় রাখা আগে দরকার। ব্রাশ সপ্তাহে অন্তত একদিন রোদে শুকোনো দরকার। মনে রাখতে হবে ব্রাশই যত রাজ্যের জীবাণু সংক্রমণ ঘটায়, এমনকি ব্রাশ-খোঁচানো ক্ষত থেকে ক্যানসারও হতে পারে।

সাবান

খাবার আগে ও শৌচকর্মের পর হাত সাবানে ধুয়ে নেয়া দরকার। এছাড়া সাধারণ অবস্থায় কখনো কোন সময়েই সাবানের প্রয়োজন নেই। চামড়ার ওপরের কোষে যে সব বন্ধু জীবাণুরা থাকে তারা প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ ঠেকাবার কাজ করে। রাসায়নিক সাবান গাত্রত্বকের ক্ষারকীয়তা কমিয়ে দেয় (সেকারণে সাবান মাখবার পর গা বেশ খরখরে লাগে, মনে পুলক হয় যে গা বুঝি বেশ পরিষ্কার হলো), আসলে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ত্বকে বসে থাকা জীবাণুর দল, তারা পি এইচ নেমে যাবার ফলে মারা যায়, রোগ-প্রতিরোধ চক্রটি অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসক যদি বিশেষ কোন ব্যাধিতে সাবান ব্যবহারের পরামর্শ না দেন (দিলে তাকে কোন সাবান ব্যবহার করতে হবে সেটিও লিখে দিতে হবে), ততক্ষণ পর্যন্ত সাবান ব্যবহার না করলে দিব্যি চলে যায়, এ অতি পরীক্ষিত সত্য। সত্য এও যে গাত্রত্বক সতেজ রাখতে তিনটি দেশি দাওয়াই আছে, তাদের সপ্তাহে একদিন ব্যবহার করলেই চলে।

হরতুকি বহেরা আর আমলকি সম পরিমাণ মিশিয়ে তার ওপর গরম জল ঢালুন পরিমাণমত। এক গ্লাস জল হলে একটা করে আমলকি হত্তুকি বহেরা ব্যবহার করা যাবে। মিশ্রণটি সারারাত ভেজানো থাক। পরদিন ভোরে গ্লাসের তিনের চার অংশ জল খেয়ে নিন, কোষ্ঠ সাফ করতে তা অনবদ্য। বাকি একের চারে ঐ হত্তুকি বহেরা আমলকি ডলে ডলে মেখে ক্বাথটি মাথা থেকে পা অব্দি মাখুন (চোখ ভাল রাখতেও এটি ব্যবহার করা যাবে, তাই জল ও ফলগুলি যেন পরিষ্কার করে ভেজানো হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার)। কিছুক্ষণ তাদের কাজ করতে দিন। তারপর স্নান করে নিন।

একই রকম কাজ করবে, কখনো আরো অব্যর্থ ফল দেয়, নিমপাতা হলুদের মিশ্রণ। আমরা যেভাবে ব্যবহার করেছি সেটি হলো - গোটা দশেক নিমপাতা এক কাপ জলে ভিজিয়ে তা ফুটিয়ে আধ কাপ কি তারো কমে আনতে হবে, অতঃপর সে মিশ্রণে দশ গ্রাম মত কাঁচা হলুদ বেটে গোলাতে হবে। এই মিশ্রণটি সারা গায়ে মাখা যায় (চোখে আমি লাগাই নি, তেমন কোন তথ্যও পাই নি)। দেখেছি, চামড়ার রোগ অব্দি সেরে যাচ্ছে এই মিশ্রণের দাপটে। সবচেয়ে বড় কথা আপনি সাবান না মাখলেই দেখবেন আপনার কোন চামড়ার রোগ নেই! এই বিজ্ঞাপণ্য যুগে শুনতে লাগছে অবিশ্বাস্য ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষা করলেই তা টের পাওয়া যাবে।

সরষের খোল যে কোন ঘানিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ খোল গায়ে মাখলে চামড়ার ঔজ্জ্বল্য থাকে (যেমনটি সরষের তেল করে), ত্বকের রোগ তা ঠেকায় কিনা বলতে পারব না। খোল জলে ভিজিয়ে মাথায় মেখে আধঘন্টা মত রাখার পর মাথা ধুয়ে নিলে মাথা পরিষ্কার হয়, খুসকি থাকে না - এটি পরীক্ষিত সত্য।

মাথার তেল

এটি পেশ করেছেন সার্ভিস সেন্টার। তৈরির পদ্ধতি হলো - ২৫০ গ্রাম নারকেল তেল নিয়ে ভৃঙ্গরাজ কেশুত আর মেহেন্দি পাতা প্রত্যেকটি এক মুঠো করে নিয়ে তাদের শিলে থেঁতো করে তেলে মেশাতে হবে। সঙ্গে সামান্য মেথির গুঁড়োও দেয়া যায়। এবার তেলটি পাক করতে হবে। পাক হয়ে গেলে পর তা ছেঁকে পরিষ্কার শিশিতে তুলে রেখে ব্যবহার করা যায় অনেক দিনই।

শ্যাম্পু

রিঠা আমলা শিকাকাই পরিমাণ মত নিয়ে সারারাত জলে (গরম জলে তাদের প্রথমে ডোবাতে হবে) ভিজিয়ে পরদিন সকালে ফলগুলি খুব ভাল করে কচলে নিয়ে ছেঁকে তরলটি মাথার গোড়ায় মালিশ করতে হবে, মিনিট দশ পনেরো এভাবে থাকার পর মাথা ধুয়ে নিলেই হবে। হত্তুকি-বয়রা-আমলকির কথা আগেই বলা হয়েছে।

গায়ে মাখার তেল

সরষের তেল কড়াইতে নিয়ে তাতে নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ থেঁতো করে ভালভাবে মিশিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অল্প অল্প আঁচে ফুটিয়ে নিন - জানাচ্ছেন সার্ভিস সেন্টার। যখন দেখা যাবে তেলের ফেনাটা মরে গেছে, হাত দিয়ে নিমপাতাটা নাড়লে খড়খড়ে হয়েছে, তেলের রংটা সবজে হলুদ হয়ে গেছে - তখন বোঝা যাবে তেলটা তৈরি হয়ে গেছে। তাকে উনুন থেকে নামিয়ে নিয়ে পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে শিশিতে ভরে রাখতে হবে, সম্ভব হলে সামান্য কর্পূর মেশানো যায়। শিশুদেরও এই তেল মাখানো যায়, তা নিরাপদও।

হজমি

সহজ হজমি হলো - এক চামচ সাদা জিরে খুব ভাল করে চিবিয়ে খেয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে নেওয়া। একই ভাবে রাঁধুনিও খেয়ে জল খাওয়া যায়। ওদের চিবিয়ে একেবারে মিহি করে নিতে হবে, এটাই শর্ত। এছাড়া, কাঁচা আলু চাকা চাকা করে কেটে তা চিবিয়ে খেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অম্বলজনিত সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মৌরি ধনে জিরে জোয়ান পাতিলেবুর রস আর বিটনুন মাখিয়ে রোদে শুকিয়ে তাদের মিহি করে বেটে কিংবা এমনিই পরিষ্কার পাত্রে রেখে তা সময়মত ব্যবহার করা যায়।

পেট খারাপের দাওয়াই

শুকনো কড়াইকে অল্প আঁচে রেখে তিন মুঠো চাল ঢেলে তা নাড়তে হবে, দেখতে দেখতে চাল একেবারে কালো হয়ে গেলে কড়াইতে এক মুঠো সাদা জিরে দিয়ে পুনরায় নাড়তে হবে ও জিরেও কালো হয়ে গেলে তা থেকে পটপট আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে মিশ্রণটি ঠান্ডা করতে দিতে হবে। এবার তা গুঁড়ো করে নিয়ে পরিষ্কার শিশিতে ভরে রেখে দিতে হবে। কমপক্ষে চার-পাঁচ বার পাতলা পায়খানা হলে ১-২ চামচ এই গুঁড়ো খেলে পায়খানা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রয়োজনে দিনে ২ - ৩ বার এটি খাওয়া যায়। পায়খানা বন্ধ হয়ে গেলে আর খাবার দরকার নেই। এবং ৪-৫ বার পাতলা পায়খানা না হলেও খাবার দরকার নেই। দেহের মল যত বেরিয়ে যায় ততই মঙ্গল। দেখতে হবে খুব বেশি যেন পায়খানার মধ্যে দিয়ে দেহের জলীয় অংশ বার হয়ে না যায়। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার, জলবাহিত রোগ এমনকি কলেরা অব্দি ঠেকানো যায় যদি জলকে পরিষ্কার কিন্তু পুরনো (তাতে কাপড়ের ফাইবারেররা যেমন অগোছালো হয়ে যায় সেটিই ভাল ফিল্টারের কাজ করে) ন্যাকড়াকাপড়ে ছেঁকে ব্যবহার করা যায় (অন্যত্র বলা আছে)। সরল অগ্নিসার অত্যন্ত ভাল ক্রিয়া (এটিও বলা আছে)। তৎসত্ত্বেও যদি পেটের রোগ হয়, গরহজম কি অন্যান্য কারণে, তখন ঐ চাল-জিরে গুঁড়োর দাওয়াই যথেষ্ট কার্যকর।

দেহজ বর্জ্য দ্রব্যাদি বার করা

সরল অগ্নিসার অতীব প্রয়োজনীয় ব্যায়াম। ঈষদুষ্ণ জল পাতিলেবুর রস সহযোগে পান করলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে। ত্রিফলা ভাল কাজ দেবে। রান্নায় নারকেল ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তেমনি শাকপাতা। শুদ্ধ মনের সঙ্গে সুস্থদেহ জড়িত আর সুস্থ দেহ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে অসম্ভব। এছাড়াও কিছু ভেষজ পাতা যথা, সোনাপাতা ইত্যাদি আছে যাদের পরিচয় যে কোন আয়ুর্বেদিক কবিরাজি দোকানে পাওয়া যেতে পারে সেখানে খোঁজ করা যেতে পারে। এমনিতে ভেষজ গাছগাছালি সম্বন্ধে জানতে যাওয়া যেতে পারে www.indiamedicine.nic.in কিংবা www.ayuherbal.com ইত্যাদিতে।

মেয়েদের ঋতু-সমস্যায়

মাতৃঅঙ্গে ঐ ত্রিফলার জল ব্যবহারে বহু রোগব্যাধি ঠেকানো যায় কিন্তু দুঃখের কথা কি শহর কি গ্রাম কোথাও মেয়েরা নিজেদের এই অঙ্গ টি নিয়ে সতর্ক নন। পাশ্চাত্যে একটি শক্তিশালী মেয়েদের সংগঠন গড়ে উঠেছে, তাদের বৈদ্যুতাবাস হলোwww.wen.org.uk, তারা তাদের দেহে রূপচমকিত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ে অত্যন্ত সচেতন, এবং ইংলন্ডের পণ্যপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানেরাও তাদের দাবির কাছে মাথা নোয়ায়। এখানে নিজেদের বিকল্প নিজেদের গড়ে নিতে হবে। নারীদেহের সবচেয়ে বড় সমস্যা শ্বেতপ্রদর - ত্রিফলা ভেজানো জল উপকার দেবে। এর পরের সমস্যা হলো ঋতুচক্রে নানাবিধ অস্বস্তি। যে পথ্যটি সবাই সর্ব অবস্থায় খেতেই পারেন তা হলো অশোক ছাল ও ফুল। সাধারণভাবে এটি ব্যবহার করলে ঋতুচক্রজ ব্যাধি বড় আকারে ছড়াতে পারে না। পথ্যটি এভাবে তৈরি হবে - ১০ গ্রাম শুকনো অশোক ছাল ১ কাপ দুধে মিশিয়ে নিয়ে তাতে ৪ কাপ মত জল মিশিয়ে মিশ্রণটিকে অল্প আঁচে ফুটিয়ে নিতে হবে। ফোটাবার পর মিশ্রণটি যখন ১ কাপে এসে ঠেকবে তখন তাকে

ঠান্ডা করে খেতে হবে। ব্যবহারবিধি হলো - সারাদিনে এক থেকে দু বার ঐ ক্বাথটি মহিলারা খাবেন। একমাস ধরে প্রতিদিন এটি খেয়ে যেতে হবে।

ঋতুপরিবর্তনে

ঋতু পরিবর্তনের সময় তাপমাত্রার হঠাৎ হেরফেরের কারণে ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের মাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে শরীর কখনো সাম্য হারিয়ে ফেলে, জ্বর কাশি সর্দি ইত্যাদি দিয়ে ব্যাধিটি প্রকাশ পায়। তারপর তো চিকিৎসকেরা 'অজানা' ভাইরাসের পেছন ধাওয়া করে ব্যাপারটাকে কখনো ঘুলিয়েও দেন। যাদের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের সমতা ব্যাহত হবার সম্ভবনা থাকে তাদের জন্যে একটি দেশজ দাওয়াই (প্রকৃতপক্ষে এটি শিবকালী ভট্টাচার্যের দাওয়াই, কলানবগ্রামের শিক্ষা নিকেতনে তিনি শ্রদ্ধেয় বিজয় ভট্টাচার্যকে এটি জানান, তারপর থেকে শিক্ষা নিকেতনের বন্ধুরা নিজেরা ও সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য এটি ব্যবহার করে থাকেন, বন্ধু অনীশ আমাকে এই তথ্যটি দিয়েছেন) হলো - একটি শিউলি পাতা আর দশটি তুলসি পাতা ভাল করে ধুয়ে প্রতিদিন খালিপেটে খেতে হবে, ঋতুপরিবর্তনের আগেপিছের পনেরো দিন মতন। অর্থাৎ, শীত যাই যাই করছে কিন্তু যায় নি, এদিকে গরমও যেন থাবা বসাচ্ছে, এমন সময়ে পনেরো দিন ধরে যদি ঐ পাতাদুটি খাওয়া যায় তাহলে কাজ হয়। এছাড়া লক্ষ করেছি ঋতুপরিবর্তনে কোষ্ঠ অপরিষ্কারের একটি ইঙ্গিত যেন রয়েছে। বিহারি বন্ধুরা এ সময় কোষ্ঠ সাফাইয়ের অভিযানে নামেন। খেয়ে নেন মেথির মণ্ড, লিট্টি প্রভৃতি। যে কোন বিহারি বন্ধুর থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। কোষ্ঠ সাফ করার চেষ্টা করুন - ব্যাধির প্রকোপ থেকে রেহাই পাবেনই।

প্রবল গরমে বিহারি বন্ধুরা ছাতুর শরবৎ খান, শরীর ঠাণ্ডা থাকে, পুষ্টিও কম হয় না - পরীক্ষাটি আমিও করে দেখেছি। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার বন্ধুরা এটি হামেশা করে থাকেন। ওদের ভাত-পাতে বাড়তি থাকে মাছের টক, পোস্ত, কলাইয়ের ডাল, কাঁচা পেঁয়াজ - কলকাতা শহরে এটি ভৌগোলিক কারণেই পাল্টে যাবে বলে গবেষক বন্ধুদের অনুমান। এখানে জলীয় বাষ্প বেশি থাকার কারণে রোজ পোস্ত পেট গরম করতে পারে। হালকা মাছের ঝোল, কি সেদ্ধ ভাত, শুরুতে তেঁতো শেষে টক - সুপথ্য। পুষ্টিভাত তো অতি উত্তম। বর্ষায় পায়ের তলায় সর্ষের তেল ডলে নিলে ঠাণ্ডাগরমের প্রকোপ থেকে রেহাই মেলে। শীতে একটু কড়া করে ব্যায়াম, সহজ কাজ হলো জগিং, একটু জোরের ওপর, তাতেই ঠাণ্ডা কমে যায়। লেনিন শীত এড়াতে রাতে ব্যায়াম করতেন। মাও ৎসে তুঙের শীতে ইয়াংশী নদীতে স্নান তো ছিলই। রোদের তেজ ঠেকাতে দক্ষিণের একটি প্রথা হলো - সারা গায়ে টক দই মাখা (পরীক্ষাটি আমি করে দেখি নি)। পুরুলিয়ার একটি রীতি হলো - আম-পোড়া ক্বাথটি সপ্তাহে একবার সাবানের মত করে গায়ে মাখা (পরীক্ষাটি আমি করি নি, এবং শুনেছি এই আম-পোড়া ক্বাথটি সপ্তাহে একদিনই যথেষ্ট, রোজ মাখলে এমনকি নিউমোনিয়া অব্দি হয়ে যেতে পারে, কাজেই যদি কেউ পরীক্ষা করেন সাবধান মেনে করবেন)।

পুষ্টিভাত

রাতের ভাত জলে রেখে পরদিন সকালে যা তৈরি হয় তাকে প্রচলিত ভাষায় পান্তাভাত বলে। আর দিনের ভাত জলে রেখে ঠাণ্ডা করে দিনেই তা খেলে যা হয় তাকে পুষ্টি ভাত বলে। পান্তা ভাতের মধ্যে ফার্মেন্টেশন হতে পারে, সে কারণে ঐ ভাত খেলে ভাল ঘুম হতে পারে ইত্যাদি। তার একধরনের গুণ। আর পুষ্টি ভাতের গুণ অন্যধরনের। গরমের ঝাঁঝ কাটাতে এই ভাত খুবই ভাল কাজ করে। গরম বাইরের ঘটনা কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গেরা যেমন মধ্যাঞ্চলে যারা রয়েছে তারা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসে। পাশ্চাত্যে গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা খাবার খাবার রীতি চালু আছে, কারণ গরমের সঙ্গে সঙ্গে হজমক্ষমতা কমতে থাকে। পুষ্টিভাত সে হিসেবে অতুলনীয়। এটি এ দেশে অনেক মানুষই ব্যবহার করে থাকেন। সকালে ভাত করে তাকে একটু ঠাণ্ডা অবস্থায় এনে তাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেয়া হয়। যখন মিশ্রণটি গরম কাটিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওঠে তখন তা খাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখেছি এতে বাইরের গরমের ঝাঁঝ কমে যায়, শরীর অভ্যন্তরে শীতল থাকে। এদেশের প্রধান সমস্যা গরম। সেক্ষেত্রে পুষ্টিভাত আবশ্যকীয় খাদ্য। রোদে কোথাও বার হবার আগে আকণ্ঠ জল খেয়ে নিলে রোদের তাপ ততটা লাগে না সেটিও পরীক্ষা করে দেখেছি। এছাড়া একটি বায়োকেমিক দাওয়াই আছে - ন্যাট্রাম মুর - মাত্রা ছয় এক্স কি বারো এক্স। গরমের সময় নিয়মিত একবার করে (চারটি বড়ি) খেলে গরমের তেজ হতে উপশম মেলে।

রক্তাল্পতা

আমাদের এক চিকিৎসক বন্ধু জোরের ওপর দাবি করেন, অপুষ্টিতে ভোগা এবং পোয়াতি মায়েরা অন্তত তিন মাস যদি কচুশাক আর রাজমা খান তাহলে রক্তাল্পতা থাকার কোনই সম্ভাবনা নেই। কচুশাক আর ছোলাসেদ্ধও এমনতর উপকারি খাবার। আরেক চিকিৎসক বন্ধুর মতে (তিনি রেডিয়েশন থেরাপিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং দরিদ্র ক্যানসারাক্রান্ত রোগীদের জন্যে এই দাওয়াইটার ওপরই জোর দিতেন) - খোসাসুদ্ধু পেঁপে আর কাঁচকলা পরিমাণমত নিয়ে জলে সেদ্ধ করে সেই জলটা স্বাদ আনাতে নুন-মরিচ দিয়ে খেয়ে নিতে হবে, মাস তিনেকের মধ্যে রক্তাল্পতা কেটে যাবে যদি না অবশ্য রক্তের কোন জটিল ব্যাধি থাকে। জলটা খেয়ে নেবার পর খোসা ছাড়িয়ে পেঁপে কাঁচকলা যেমন খুশি

তেমন রেঁধে খাওয়া যাবে। পেঁপের খোসা তিক্ত তা খাওয়া যায় না, কিন্তু কাঁচকলার খোসা চটকে বড়া করে খাওয়া যায়।

আকাশ

আকাশকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করার দুটি শিক্ষা পেয়েছি। এক, বিনোবা ভাবে(দুই, হীরা রতন মানেক (সুস্থদেহ পর্বটি দ্রষ্টব্য)। গ্রামদেশের মানুষ বর্তমানে অজ্ঞতার কারণে অসুস্থ হচ্ছেন ঠিকই কিন্তু যতটা তারা ভাল থাকেন, তাদের আহারের মাত্রা নিয়ে যেটুকু অনুসন্ধান করেছি তাতে নিশ্চিত হয়েছি দৈনিক তিন হাজার ক্যালরি তাদের পক্ষে জোটানো অসম্ভব। তাহলে তারা ভাল থাকেন কিসের জোরে? বিনোবা এমনটাই দেখিয়েছিলেন এবং সম্ভবত এটি যথার্থ যে তারা পান করেন আকাশ, খোলা আকাশের তেজ তাদের শরীরকে নিরোগ রাখতে সহায়তা করে। আমি পরীক্ষা করি নি কিন্তু আমাদের বন্ধুরা পরীক্ষা করে দেখতেই পারেন রোজ কতটা খোলা আকাশের নিচে থাকলে খিদে কতটা কমে এবং পুষ্টিও অব্যাহত থাকে। দিনে একঘণ্টা তো মুক্ত আকাশের নিচে থাকা যায়ই। সেভাবে থেকে দেখা যেতে পারে খাবার পরিমাণ কমিয়ে ভাল থাকা যাচ্ছে কি না।

মাটি

ইতিমধ্যেই মাটির বাড়ি বিশ্বে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে। মাটির বাড়ির সঠিক বিজ্ঞান জেনে করতে শিখলে কি গরম কি শীত (বর্ষাতেও) ভাল থাকা যায়। গ্রাম শহর সব বন্ধুরাই পরীক্ষা করতে পারেন। একটা ঘর যদি বা সিমেন্টের হয়, একটি হোক চুনসুড়কির, আর একটি হোক মাটির। এমন কাজের খবর পেয়েছি। তা পরখ করে দেখা যেতেই পারে কোনটে কি সময়ে ভাল ফল দিচ্ছে। মাটির বাড়ি বানাবার জন্যে এদেশে যারা ইতিমধ্যে বিশ্বে সমাদৃত হয়েছেন তাদের কয়েকজনের বৈদ্যুতাবাস দিচ্ছি, সেখান থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলা যেতেই পারে -
www.devalt.org (এদের বাড়িটাও মাটির)(
www.iisc.ernet.in (বাঙ্গালোর আই আই এস সি ক্যাম্পাসে এদের বাস)(
www.aurovile.org (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গবেষকবৃন্দের গড়া)।
এছাড়া যোগাযোগ করা যাবে মৃৎকার লউরি বেকারের সাথে - Laurie Baker, Building Centre, Sector 6, R K Puram, New Delhi 110 022, Tel 6188601। এবং চিত্রা বিশ্বনাথের সঙ্গে - Chitra Viswanath, 264/6th Main/6th Block, BEL Layout, Vidyaranyapura, Bangalore 560 097, Tel 080 3641690।

ঘরোয়া ময়লার সদ্ব্যবহার

রান্নাঘরের ময়লা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। ভাবা দরকার টয়লেটে ব্যবহৃত ব্ল্যাক ওয়াটার ও গ্রে ওয়াটার নিয়ে। মলমূত্রাদি বাহিত যে জল তাকে বলে ব্ল্যাক ওয়াটার, আর স্নান কাচাকুচির জলকে বলা হয় গ্রে ওয়াটার। সারা বিশ্বে আজ এই অশনি সংকেত স্পষ্ট রূপ নিয়েছে যা হলো মিঠা জল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। ভুবনের বন্ধুরা পিছিয়ে নেই, কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাবে তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এদেশে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। আগ্রহী জন যোগাযোগ করতে পারেন। ওদের কাজের বিশেষত্ব হলো তাতে যেমন তত্ত্বের ধার আছে তেমনি আছে নির্মাণের প্রতি জেদ। ওদের বৈদ্যুতাবাস ঘুরে আর যেসব ঠিকানা পেয়েছি (এই জল বিষয়ে) তারা হলেন -
www.graywater.net ;
www.doityourself.com ;
www.exploratorium.edu ;
sin.fi.edu .

ভারী সুন্দর একটি নির্মাণের কথা পেয়েছি দিল্লির তিনটি বাচ্ছার কাছ থেকে। তারা তাদের সিস্টার্নে একটা ইঁট রেখে দিয়েছে। তারা হিসেব করে দেখেছে একটা ইঁট দু লিটার জল বাঁচায়। সেই হিসেবে তারা দিনে কত লিটার জল বাঁচাতে পারল তারও অঙ্ক কষে দেখিয়েছে।

যাব ঘরে। সেখানে থাকুক একের বদলে চারটে পাত্র - ময়লা রাখার। প্রথম দুটো থাকবে রান্নাঘরে। একটিতে রাখা হবে আমিষ যত খাবারের টুকরো, আনাজপাতি ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি ভরা থাক আমিষ দ্রব্যে - আমিষ নিরামিষ যেন একসাথে না মেশে সেদিকে নজর দিতে হবে। পাশ্চাত্যে ডিমের খোলা কেঁচো চাষে ব্যবহার করা হয়, কেঁচো নাকি গুঁড়ো খোলা খায়ও, সর্বোপরি কেঁচোর পরিবেশটি ক্যালসিয়াম বাড়বার ফলে ক্ষারীয় হয়ে থাকে (একই কারণে ওরা টক জাতীয় ফল বেশি ব্যবহার করতে চান না, তার কারণে মাটি আল্পিক হয়ে উঠতে পারে)। এই নিরামিষ ঝুড়িটি কেঁচো চাষে ব্যবহার করা যায়। শিখতে হলে যাওয়া যেতে পারে - www.wormdigest.org এ। তৃতীয়টিতে থাকবে অক্ষ তিকর দ্রব্যাদি যথা কাগজ, কাঁচের শিশি, প্লাস্টিক ইত্যাদি। তা কাগজকুড়ানিদের দিয়ে অর্থ সঞ্চয় করে মাইক্রোব্যাঙ্ক গড়া যায়। চতুর্থটিতে

থাকবে বিষাক্ত দ্রব্যাদি যথা ব্যাটারি, ব্যবহৃত তুলো, ইত্যাদি। যদিও আমরা সব ধরনের ময়লা মিশিয়ে ভ্যাটে ফেলি কিন্তু এ অনুচিত। বিষাক্ত দ্রব্যাদি কখনোই অন্য সবের সঙ্গে ফেলা উচিত নয়। তা আলাদাভাবে ফেলা দরকার, রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সজাগ করার দায় আমাদের সব মানুষের।

আর এটাই জীবনের সহজ পাঠ। দেহে সুস্থ থাকা(মনে দৃঢ় অশুভনাশী তেজে ভরপুর থাকা(নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজে হাতে তৈরি করে নেয়া(পুষ্টিকর খাবারটি খাওয়া(সব্জিবাগান করে খাদ্যবৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখা(শ্রীময় সংসার-সাধন(বিপদে নির্ভীক থেকে এগিয়ে চলা - এই তো বাঁচা(সবাইকে নিয়ে, সবার মঙ্গল করতে করতে বাঁচা।

স্বাশ্রয়ভাবনা (২০০৫)

সামাজিক, রাজনৈতিক আশ্রয়চ্যুতির মধ্যে পুনরায় আশ্রয় গড়ে তোলার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক আশ্রয় সন্ধানের এক অনন্য বার্তা। বাস্তুহীন হচ্ছে মানুষ, আশ্রয় খুঁজছে। এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে রাজনীতি, রণনীতি এবং অর্থনীতি। এ এক দিক। এরপর রয়েছে আত্মিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানতাত্ত্বিক আশ্রয় অনুসন্ধান। অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে ঈশ্বরের না-ঈশ্বরের প্রসঙ্গ। সবশেষে ভাবা হয়েছে সত্যের বিভিন্ন ঘর ধরে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয় কেমন হতে পারে তার ভাবনা - সেখানে পার্টিসিপেট করছে কোয়ান্টাম জগতের সেই বেড়ালটিও যে একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত, নির্ভর করে আছে তাকে খুঁজতে এসেছেন যে ভাবুক-বিজ্ঞানী তাঁর স্বাশ্রয়ভাবনার ওপর। সেখান থেকে একটি লেখা

আশ্রয়ের খোঁজে শ্রোডিংগারের বেড়াল ও আরো কিছু

অশোক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়

আর্ভিন শ্রোডিংগার বেড়াল পছন্দ করতেন কি না জানিনা। এ ব্যাপারে আমার মাষ্টারমশাইয়ের মাষ্টারমশাই ওয়াল্টার মূর হয়ত আলোকপাত করতে পারতেন। তবে এমনই একটি বেড়ালের সঙ্গে তাঁর নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ১৯৩৫ সাল থেকে, সৃষ্টিকর্তার নাম ছাড়া যার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে সে অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকে।

আরেকটু গোড়ার থেকে শুরু করা যাক। বিগত শতকের গোড়ার দিকে যে নতুন পদার্থবিদ্যা উঠে আসছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, সেটা এখন কিছু পরিমাণে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের অঙ্গ। বিজ্ঞানের অঙ্গভঙ্গির ক্রমিক রীতি এরকমই, পাঠক্রমের আঙ্গিকে ঢুকে পড়ে অতীতের বিস্ময়কর আবিষ্কার - যা কোন পলিতকেশ বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হয়ত সারাজীবনের পরিশ্রমের ফল হিসেবে পেয়েছিলেন। এভাবেই আমরা স্কুল শেষ করার আগেই পড়ে ফেলি কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ও প্ল্যাংকের সূত্র (১৯০০), আইনস্টাইনের ১৯০৫-এর স্বর্ণপ্রসূ সময়, বোর সাহেবের মঞ্চে আগমন (১৯১২-১৩), ফ্রাংক-হার্ৎজ (১৯১৪), কম্পটন (১৯২২), ডেভিসন-জার্মার (১৯২৭) প্রভৃতির পরীক্ষানিরীক্ষা, দ্য ব্রগলির দ্বিচারিতার সূত্র (১৯২৩-২৪) ইত্যাদির হাত ধরে ১৯২৫-২৬ সালে হাইজেনবার্গ, শ্রোডিংগার ও ম্যাক্স বর্ন মারফৎ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সূচনা হলো।

ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, সব সময়ে, কি মানব সমাজে কি প্রকৃতিতে, পরিবর্তনটাই আসল। অর্থাৎ স্থির থাকে না কিছুই, সবই পরিবর্তনশীল, হয় ক্ষীয়মান নয় বর্ধমান। এখানে আবার দ্বান্দ্বিক নীতি প্রয়োগ করতে হয়, নইলে বেশ কিছু বিজ্ঞ লোক বিলক্ষণ চটে যান। তা সেই নীতির সাহায্যে বুঝি বা না বুঝি, যেটা দেখতে পাই তা হলো বাহ্যিক পরিবর্তন আর তার সঙ্গে আমাদের জগৎবীক্ষার বা দর্শনের পরিবর্তন, এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও সেটা দুই সতীনের বা দুই পড়শির মধ্যেকার সম্পর্কের মত। একজন কিছু করলে অন্যজনও তাই করেন, কিন্তু একটু দেরি করে। অর্থাৎ দুই পরিবর্তনের গতি দুরকম। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় যারা দূরদর্শী, সাধারণভাবে যাদের দ্রষ্টা বলা হয়, তারাই পরিবর্তনের পিছনে থাকেন, তার নেতৃত্ব দেন। আমজনতার দৃষ্টি অতদূর না যাবার ফলে তারা সকলে পরিবর্তনটা মেনে নাও নিতে পারেন। অথবা নিজের মত করে ব্যাপারটা বোঝেন। এর ফল সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, সমাজকে একদিকে বা তার বিপরীতে নিয়ে যেতে পারে, অন্তত কিছু পরিমাণে বা কিছু সময়ের জন্য।

যেমন আমরা ধরে নিই যে তড়িৎচুম্বকের ক্ষেত্র আর আলোর তত্ত্ব, যা আমরা ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বলে জানি, সেটা উনিশ শতকে মোটামুটি পাকা হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য উনিশ শতকের শেষে প্ল্যাংকের সূত্র অতটা চমকে দিতে পেরেছিল লোকজনকে। আসলে কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে আর পরিমার্জিত চেহারায় তাকে সকলে মেনে নেন উনিশ শতকের শেষ দশকে। হেল্‌ম্‌হোলৎজ, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের একজন নেতা, এই তত্ত্বকে মানতে পারেন নি ১৮৮৮ সালেও। অণু ও পরমাণু না মানার লোক সংখ্যায় আরও বেশি ছিলেন। মাখ্, যাঁর পজেটিভিস্ট দর্শন আইনস্টাইনকে একসময়ে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল(অস্টভাল্ড, যিনি রসায়নে নোবেল পান ১৯০৯ সালে(এমনকি বোলৎস্‌মান পর্যন্ত একটা সময়ে অণুর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। কারণ তা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীর

প্রথমদিকে বিভিন্ন পরীক্ষার ফল বার হবার পর ওঁরা নিজেদের মত পাল্টান।

ঐ সময়টাই এমন ছিল। ভিক্টোরীয় যুগের অবসান ১৯০১এ। তার আগেই ফ্যাঁ দ সিয়েক্‌ল্‌ (fin de siecle) নিয়ে কথা হচ্ছে। লর্ড কেলভিন লন্ডন শহরে বক্তৃতা দিলেন 'তাপ ও আলোর গতিবিজ্ঞানের ওপর উনবিংশ শতকের মেঘ'। ঠিক যেমন প্রায় একই সময়ে পারীতে হিলবার্ট তাঁর বিখ্যাত সমস্যাবলীর উল্লেখ করে বলেন সেগুলির সমাধান হলে অঙ্ক (তথা অন্য ভৌত) বিজ্ঞানে জানার আর কিছু বাকি থাকবে না। হিলবার্টের একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গণনক্ষমতা ও তার সীমানা, গোডেল, চার্চ ও ট্যুরিংয়ের মারফৎ আধুনিক যন্ত্রগণক অর্থাৎ কম্পিউটার উদ্ভূত হয়েছে। তেমনই কেলভিন দুটি সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন - ঈথারের মধ্য দিয়ে গ্রহনক্ষত্রের বিনা বাধায় যাতায়াত আর কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ শক্তির সমবণ্টন সূত্র অনুযায়ী মাত্রার কম নির্ণীত হওয়া। প্রথম প্রশ্নের ওপর চূড়ান্ত পরীক্ষা আগেই হয়ে গেছে, মাইকেলসন ও মর্লি সেটা করেছেন ১৮৮৬ সালে। তার ওপর লোরেনৎস্‌, পয়ঁকেয়ার প্রমুখ অনেকেই কাজ করেছেন, ফর্মুলাও লেখা হয়েছে কিন্তু শেষ কথা বলবেন আইনস্টাইন (১৯০৫)। সেই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরে এল সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (১৯১৫-১৬), এবং ১৯১৯ সালের মে মাসে সূর্যগ্রহণের সময়ে সেই তত্ত্বের পরীক্ষা এবং সফল ভবিষ্যৎবাণীর জন্য পৃথিবী জুড়ে আইনস্টাইনের সম্বর্ধনা। এটা ভাবলে অবাক লাগে যে এই আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, যা খুব দ্রুতগামী বস্তুর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেহারা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকশ বছরের পুরনো ধারণা রাতারাতি পাল্টে দিল, তা কিন্তু বিজ্ঞানী মহল যথেষ্ট তাড়াতাড়িই মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ সম্বন্ধে স্বাভাবিক ধারণার বিরুদ্ধে যায় আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম তত্ত্বও। কিন্তু ১৯০০ সালের প্ল্যাংক সূত্রের ওপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন যখন ১৯০৫ সালেই প্রথম আলোককণার কথা বললেন, যথেষ্ট বিরূপ মন্তব্য শুনতে হয়েছিল তাঁকে। ঐ বছর তিনি ঘনবস্তুর আপেক্ষিক তাপের প্রথম ব্যাখ্যা দেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের সেই প্রথম ব্যবহার হলো কোনও ক্ষেত্রে। সেটা অবশ্য লোকে মেনেছিল তাড়াতাড়ি। এমনকি ১৯১৩ সালে প্ল্যাংক, নার্নস্ট প্রভৃতিরা যখন আইনস্টাইনকে বার্লিনের প্রাশান একাডেমির সদস্যপদে মনোনীত করলেন, তাঁর 'আলোককণা নিয়ে বাড়াবাড়ি' সম্বন্ধে কটাক্ষ করা হয়েছিল। যার জন্য ১৯১০ সাল থেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য বারবার নাম প্রস্তাবিত হওয়া সত্ত্বেও পুরস্কার মিলল ১৯২২ সালে, ১৯২১ সালের পদার্থবিদ্যার পুরস্কার হিসেবে।

আসলে প্ল্যাংক, লোরেন্‌ৎস প্রমুখ যাদের আইনস্টাইন নিজের পূর্বসূরী বলে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন, তারা সকলেই আলোককণার অস্তিত্ব মেনে নেন কেবল বস্তু ও বিকিরণের মিথষ্ি(য়ার সময়। শুধু বিকিরণ বলতে সকলেই উনিশ শতকের ম্যাক্সওয়েলের দেয়া অনবচ্ছিন্ন আলোকক্ষেত্রই বুঝতেন। আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচক হিসেবে কিছু কাজের উল্লেখ করতে হলে ১৯০০ সালে প্ল্যাংকের কৃষ্ণবস্তু বিকিরণ সম্বন্ধে $e = n.h.\upsilon$ সূত্র, ১৯০৫ সালের আলোককণার উপপাদ্য, ১৯১৩ সালের বোরের পরমাণুর মডেল আর ১৯২৩-২৪এ দ্য ব্রয়লির তরঙ্গ-কণার দ্বিচারিতা তত্ত্বের কথা বলতেই হয়। প্ল্যাংকের সূত্র যেন পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে মিলিয়ে দেবার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল, প্ল্যাংক নিজে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। দ্য ব্রয়লির তত্ত্ব যে বছর প্রথম প্রকাশিত হয়, কম্পটনের পরীক্ষার ফল সে বছরই জানা যায়। আলোক তরঙ্গের যে কণার ধর্ম আছে তার প্রথম প্রমাণ তাই। আইনস্টাইনের আলোককণার তত্ত্বের গ্রহণ কিরকম হয়েছিল তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বোরের পরমাণুর মডেল? সমারফেল্ড সেবছরই বোরকে জানান, রীডবার্গ-স্থিরকের মান তাত্ত্বিকভাবে নির্ণীত হওয়া নিঃসন্দেহে খুব বড় কাজ, কিন্তু পরমাণুর মডেল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। সন্দিহান ছিলেন আরও অনেকেই। সুইৎজারল্যান্ডের উটলি গ্রাম বেড়াতে গিয়ে অটো স্টার্ন আর ম্যাক্স ফন লাউএ পরপারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে বোরের এই 'ননসেন্সে' যদি কিছু মাত্র সত্য থাকে তারা ফিজিক্স ছেড়ে দেবেন (১৯১৪)। ভাগ্যিস দেননি!

শ্রোডিংগারের বেড়াল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ও সেই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন আর বোর - এই বিষয়গুলি বাদ দেয়া যায় না। কারণ এ কাহিনীর নামভূমিকায় শ্রোডিংগার থাকলেও প্রকৃত কুশীলব হলেন আইনস্টাইন আর বোর(ঝগড়া নয়, কোয়ান্টাম জগতে আশ্রয় নিয়ে এক অভূতপূর্ব মনান্তর। এটা কাকতালীয় নয় যে বোর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পান আইনস্টাইনের পরের বছরই, ১৯২২ সালে। দুজনের প্রথম দেখা হয় ১৯২০ সালে বার্লিনে। দেখামাত্র এঁরা পরস্পরকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেন, এমনকি ভালবাসা জন্মে যায় দুজনের মধ্যে। এঁরা সারাজীবন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন, কিন্তু প্রথম দর্শনের কয়েক বছর পর থেকেই একে অপরকে প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করতেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা গড়ে ওঠার কাহিনি আসলে এই দুই মহারথীর মানসিক টানাপোড়েনের গল্প। যার জন্য দেখি আনকোরা পোস্টডক্টরাল ছাত্রের কাছে বোর বলে যাচ্ছেন আইনস্টাইন এরকম প্রশ্ন করলে তিনি কি উত্তর দিতেন! অথবা সত্তরোর্ধ আইনস্টাইন বেড়াতে গিয়ে সাথিকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করছেন, 'আচ্ছা, আমরা না দেখলে কি আকাশে চাঁদের অস্তিত্ব থাকে'? যেহেতু তাঁর আর বোরের মধ্যে মতবিরোধ এই বিষয় নিয়েই দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ বাস্তবসত্য সম্ভব কি না। আইনস্টাইন মনে করতেন তা সম্ভব। বোরের কাছে তাঁর পরিপূরক নীতি (কমপ্লিমেন্টারি প্রিন্সিপল) বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাস্তবতার চাইতে। যে কারণে তিনি বলতেন চাঁদ আছে কি না সে প্রশ্নে না গিয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত সে ব্যাপারে কি ধরনের পরীক্ষা করা হচ্ছে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। তার প্রেক্ষিতে আমরা কি জানতে পারি তা বলা যাবে। অবশ্যই বোরের ক্ষেত্রে চাঁদ মানে হলো কোয়ান্টাম জগতের কোনও অধিবাসী। কারণ বোরই আগে দেখিয়েছেন তাঁর প্রতিসম্পর্কের নীতিতে (করেসপন্ডেন্স প্রিন্সিপল) কিভাবে কোয়ান্টাম জগৎ থেকে একটানা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে আমরা বৃহৎ বস্তুজগতে চলে আসতে পারি।

কিন্তু বেড়ালের দেখা এখনও মিলবে না। আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে। কোয়ান্টাম জগৎ সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছুটা পরিচয় হোক। আমাদের

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবন থেকে এটা বড়ই আলাদা। বোর যেমন বলেছিলেন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে যিনি শক পাননি, তিনি ওই তত্ত্ব বোঝেননি।

একদিক থেকে প্রায় সমস্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলে রয়েছে কোয়ান্টাম-লাফ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আলোককণার উদ্ভব বা বিলয়। হাইড্রোজেনের বা যে কোনও পরমাণুর নির্দিষ্ট কক্ষে একটি ইলেকট্রন বিশেষ শক্তির আলোককণা শোষণ করে অন্য উচ্চতর কক্ষে যেতে পারে। অথবা সেই ইলেকট্রন নিম্নতর শক্তির কক্ষে লাফ দিয়ে এসে একটি নির্দিষ্ট শক্তির আলোককণা বিকিরণ করতে পারে। আইনস্টাইন এ ধরনের সমস্যায় যতদূর গৌড়ীয় বিদ্যা প্রয়োগ করা যায় তার পক্ষপাতী ছিলেন। কেবল আলোককণা বাদে। প্ল্যাংক, সমারফেল্ড, এহ্রেনফেস্ট, লোরেন্ৎস সকলেই মনে করতেন ফোটনের উদ্ভব বা বিলয় হয় আলো বা কোনও তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের সঙ্গে বস্তুর (ম্যাটার) সম্বন্ধ ঘটার ফলে। বোর, স্লেটার ও ক্রামার্স নামের দুজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ১৯২৪ সালে একটি প্রস্তাব দেন (BKS তত্ত্ব) যেখানে বলা হয় শক্তি একাধিক রূপ নেয় পরমাণুর ভিতর এবং সেখানে বিচিত্র মিথষ্ক্রি(য়ার ফলস্বরূপ ফোটন নির্গত হয় অথবা শোষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তির সংরক্ষণবাদ খাটে না। আইনস্টাইন প্রস্তাবটি শোনা মাত্র বিরূপ মন্তব্য করেন। ফলে বিজ্ঞানী মহল স্পষ্টত একটি সংকটে পড়ে, যাকে হাইসেনবার্গ পুরনো কোয়ান্টাম তত্ত্বের শেষ বড় সমস্যা বলেছেন। তবে ঐ বছরই ও তার পরের বছর দুটি পরীক্ষায় BKS তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হলো। তার মধ্যে ১৯২৫ সালে কম্পটনের পরীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ফোটন কণার অস্তিত্ব ছাড়াও কম্পটন-প্রক্রিয়ায় ভরবেগ ও শক্তির সংরক্ষণবাদ বজায় থাকে তাও পরিষ্কারভাবে দেখানো গেল। আলোককণা বা ফোটনের অস্তিত্ব নিয়ে লোকের সন্দেহ আর রইল না। এরপর ১৯২৬ সালে একজন ভৌতরসায়নবিদ গিলবার্ট লুইস আলোককণার নাম দিলেন ফোটন।

এর মধ্যে ১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি চিঠি ও তার সঙ্গে একটি গবেষণাপত্র পৌঁছয় আইনস্টাইনের হাতে। গবেষণাপত্রে বসু প্ল্যাংকের কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ সংক্রান্ত কাজের একটি নতুন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন। প্রায় একই কাজ করেছিলেন পোলিশ বিজ্ঞানী নেতানসন ১৯১১ সালে কিন্তু তা তখন বিস্মৃত। যাইহোক বসুর কাজের পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইন তিনটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ১৯২৪-২৫ সালে, যেগুলি দিয়ে কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানতত্ত্বের গোড়াপত্তন হলো বলা যায়। এগুলি থেকেই বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের উদ্ভব, ম্যাক্সওয়েল-বোলৎস্মানের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তার তফাৎ আর ফার্মি-ডিরাক পরিসংখ্যানের সূচনা। শুধু তাই নয়, আইনস্টাইন তখনই ভবিষ্যৎবাণী করেন বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবনের, কোথায় কিভাবে তা দেখা যাবে তাও বলে দেন। ১৯৩৮ সালে হিলিয়ামের একটি অবস্থার পরিবর্তন প্রথম লক্ষ করা গেল যাকে ঐ ঘনীভবন প্রক্রিয়া বলে বোঝা গেল।

এর মধ্যে নার্নস্ট, যিনি কেবল ভাল পরীক্ষক ও তাত্ত্বিক ছিলেন না, ভাল সংগঠকও ছিলেন, মনে করলেন এসব নতুন নতুন কাজের কথা আলোচনা করার জন্য কনফারেন্স করা দরকার। সলভে, সোডা অ্যাশ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন, সাহায্য করতে রাজি হলেন। প্রথম সলভে অধিবেশন হলো ব্রাসেল্সে, ১৯১১ সালে। বিকিরণ ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর। লোরেন্ৎস, প্ল্যাংক, ডীন, সমারফেল্ড, নার্নস্ট, রাদারফোর্ড, হ্যাসেনোর্ল, জীনস এরা ছিলেন। এহ্রেন্ফেস্ট আসেননি। বোর, ডিবাই ও বাকিরা তখন ছোট। আইনস্টাইন শেষ বক্তা হিসেবে আপেক্ষিক তাপের কোয়ান্টাম ব্যাখ্যা দেন ও সেইসঙ্গে অলোককণারও উল্লেখ করেন।

এরপর আমরা সরাসরি ১৯২০র দশকে চলে যাই। ১৯২২এ কম্পটন পরীক্ষা আর ১৯২৫ সালে তা পুরোপুরি বোঝার পরে আলো আর ইলেকট্রনের কণা বা বস্তুধর্ম আর এদের সংঘাতে শক্তি ও ভরবেগের সংরক্ষণের কথা জানা গেল। ইতিমধ্যে ১৯২৩-২৪ সালে দ্য ব্রয়লি তাঁর কোয়ান্টাম জগতে দ্বিচারিতার নীতি বলেছেন। আইনস্টাইন প্রমুখ সকলেই তা পড়েছেন, জেনেছেন। কোপেনহাগেন (বোর, ক্রামার্স) আর গটিংগেন (বর্ন, ফ্রাংক, সমারফেল্ড, পাউলি, হাইজেনবার্গ)-এর মধ্যে ভাল যোগাযোগ ছিল। তাই বোরের মাধ্যমে হাইজেনবার্গের ওপর প্রায় সকলের প্রভাব পড়ে। ইতিমধ্যে স্টার্ন-গ্যারলাখ পরীক্ষায় ইলেকট্রনের ঘূর্ণন আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু তার মনোমত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে ১৯২৫এ উহ্লেনবেক ও গুডস্মিট ঘূর্ণনের (স্পিন) কথা বললেন। পাউলির নিজের দেয়া তত্ত্ব, কিন্তু তিনি নিজেই স্পিনে বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৬ সালে থমাস পুরো হিসেব আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়ে মিলিয়ে দিলে পরমাণুর অন্তর্গত কণাগুলির কৌণিক ভরবেগের ছবিটা পরিষ্কার হলো। এর মধ্যে ১৯২৩ সালে স্মেকাল আলোর কণার সঙ্গে বিচ্ছুরণের সম্পর্ক নিয়ে বললেন, যার প্রথম পরীক্ষা করেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামণ ১৯২৮ সালে। আর ক্র্যামার্স বললেন কম্পাঙ্কের সঙ্গে মেরুকরণের সম্বন্ধের কথা।

১৯২৫ সালের জুলাই মাসে বার হলো কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রথম গবেষণাপত্র, হাইজেনবার্গের। বোরের মডেল আর ক্র্যামার্সের তত্ত্ব মিলিয়ে কাজ করেছিলেন তিনি। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে বর্ন আর জর্ডানের ম্যাট্রিক্স দিয়ে হাইজেনবার্গের নিয়মগুলি যে আনা যায় তা দেখানো হলো, শুরু হলো ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা। নভেম্বরে এল বর্ন, হাইজেনবার্গ আর জর্ডানের মিলিত কাজ, আগের দুটি তত্ত্বের মিলন দেখানো। কমিউটেশন নীতি বলে একটি নতুন কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম দেখানো হলো। যে দুটি চলকের মধ্যে কমিউটেশনের ফল শূন্য নয়, তাদেরই বোর পরে প্রতিপূরক নাম দেবেন। এরকম দুটি চলকের একসঙ্গে মাপজোক নিয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি হবে কোয়ান্টাম জগতে। প্রায় একই সময়ে ডিরাক ক্ল্যাসিকাল পদার্থবিদ্যার পয়সঁ ব্র্যাকেটের সঙ্গে কমিউটেশনের সম্বন্ধ দেখালেন। জানুয়ারি ১৯২৬ ও জানুয়ারি ১৯২৭এ এল পাউলি আর ডিরাকের কাজ, হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাখ্যা হাইজেনবার্গ ও ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যার সাহায্যে। ১৯২৬এর জানুয়ারিতে শ্রোডিংগারের প্রথম গবেষণাপত্র পদার্থের তরঙ্গ সূত্রের ওপর, ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় পেপারে ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যার সঙ্গে নতুন বলবিদ্যার তুলনা করা হলো, কিছু উদাহরণও পাওয়া গেল। মার্চ মাসে তৃতীয় পেপারে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে হাইজেনবার্গ, বর্ন, জর্ডানদের থিয়োরির একতা দেখানো হলো। মে মাসে ক্ল্যাসিকাল কম্পনতত্ত্বের পার্টার্বেশন রীতি তাঁর তরঙ্গ পদ্ধতিতে ব্যবহার করে শ্রোডিংগার হাইড্রোজেন পরমাণুতে স্টার্ক প্রক্রিয়ায় কি কি হতে পারে তা বিচার করলেন।

জুন মাসে তাঁর হাত থেকে এল সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল তরঙ্গ-ফাংশন ও তার আপেক্ষিকতায় প্রসার। তারপর এল তাঁর তরঙ্গ-সমীকরণের সঙ্গে ক্ল্যাসিকাল অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ আর সম্ভাবনা ও সম্ভাবনা স্রোতের ঘনত্ব।

১৯২৬এর প্রথমদিকে যে একাধিক চেহারায় সামনে এল এই নতুন মেকানিক্স, অর্থাৎ হাইজেনবার্গ, বর্ন, জর্ডানের ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা, ডিরাকের কমিউটেটার আর শ্রোডিংগারের তরঙ্গ সমীকরণ, সেটা একসঙ্গে এসে মিলল সম্ভাবনার ব্যাখ্যায়। প্রথম কাজটি করলেন শ্রোডিংগার নিজে, ১৯২৬এর জুন মাসে। ঐ মাসে ও তার পরের মাসে বর্নের দুটি গবেষণাপত্র বার হলো যেখানে তরঙ্গ ফাংশনগুলির (ψ)বাস্তব ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি। শ্রোডিংগারের জুন মাসের কাজ, যেখানে $\psi^*\psi$–এর ডিস্ট্রিবিউশন ক্ল্যাসিকাল কণার স্থান নিয়েছে, উদ্ধৃত করে তিনি দেখালেন যে কোনও পরিস্থিতিতে এই $\psi^*\psi$ দিয়ে কোয়ান্টাম কণার অবস্থানের সম্ভাবনা বোঝানো যায়। তাঁর মতে দ্য ব্রয়লি বা শ্রোডিংগারের তরঙ্গ যেন ইলেকট্রনের পরিবাহী ক্ষেত্র (আইনস্টাইন ও দ্য ব্রয়লি এর আগে ইলেকট্রনের পরিচালক ক্ষেত্রের ধারণা দিয়েছেন)। তাঁর ইলেকট্রন ও পরমাণুর সংঘাত ও বিচ্ছুরণের ব্যাখ্যা এইসব আইডিয়ার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল। কিন্তু এক স্টেট থেকে আরেক স্টেটে উত্তরণ বা অবতরণের ব্যাখ্যা নতুন তত্ত্বগুলির মারফৎ এখনও হয়নি।

সেটা হলো বর্নের দ্বারাই, ১৯২৬এর অক্টোবর মাসে। ψকে বিভিন্ন স্টেট ও তাদের সহসংঘটকের গুণফলের সমষ্টি হিসেবে দেখলে যে কোনও স্টেটে সিস্টেমের থাকার সম্ভাবনা যে ঐ স্টেটের সহসংঘটকের মানের বর্গের সমান। সিস্টেমের ওপর পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আর তার অতি ধীরে অপসরণ ধরে বর্ন দেখালেন অ্যাডায়াবেটিক নিয়ম কোয়ান্টাম জগতেও ঘটে। বর্নের ব্যাখ্যা সকলে দ্রুত গ্রহণ করলেন। এদিকে ১৯২৬এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে জর্ডান, লন্ডন, ডিরাক মিলে মূলত ডিরাক, হাইজেনবার্গদের মেকানিক্সকে অঙ্কশাস্ত্রের দিক থেকে নির্ভুল করার চেষ্টা করছিলেন। ১৯২৬এর শীতে গটিংগেনে হিলবার্ট তাঁর দুই ছাত্র, নর্ডহাইম আর ফন নয়ম্যানকে নিয়ে এই কাজ পুরো করলেন। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লজিক্যাল ভিত্তি সুদৃঢ় হলো। আর বাস্তবতা ও ইনটুইশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার যে চেষ্টা চলছিল, তার সমাধান হলো ১৯২৬এর অক্টোবর থেকে ১৯২৭এর মার্চের মধ্যে। মূলত পাউলি, বোর, হাইজেনবার্গদের প্রচেষ্টায় এটা করা গেল। শেষমেষ হাইজেনবার্গ দেখালেন যে কোন কোয়ান্টাম কণার অবস্থানে যদি Δx পরিমাণ অনিশ্চয়তা থাকে আর তার ভরবেগ Δp পরিমাণ, তাহলে $\Delta x \Delta p \sim h$ অন্তত। তেমনই শক্তি আর সময়ের মাপের অনিশ্চয়তা যথাক্রমে ΔE ও Δt হলে $\Delta E \Delta t \sim h$ । বোর সঙ্গে সঙ্গে বললেন তাঁর প্রতিপূরক নীতির কথা। ক্ল্যাসিকাল ক্যাননিকালি কনজুগেট রাশিগুলি যেমন অবস্থান ও ভরবেগ, বা শক্তি ও সময়, এরা পরস্পরের পরিপূরক। একটির মাপ অন্যটির মধ্যে কিছু পরিমাণে অনিশ্চয়তা অবশ্য ঢুকিয়ে দেবে।

এমতাবস্থায় ১৯২৭ সালের পঞ্চম সলভে অধিবেশন। আইনস্টাইনকে আহ্বান করা হলো কোয়ান্টাম পরিসংখ্যান নিয়ে বলার জন্য। তিনি অধিবেশনে যোগ দিলেন কিন্তু বক্তৃতা দিলেন না। বললেন তাঁর বয়স হয়েছে(নতুন যা কাজ হচ্ছে তা তিনি পুরোটা বুঝে উঠতে পারছেন না, নতুনদের বলা উচিত। দ্য ব্রয়লি, বর্ন, হাইজেনবার্গ, শ্রোডিংগার এরা নিজের নিজের মত বললেন। দ্য ব্রয়লি আর শ্রোডিংগার জানালেন বর্তমান থিয়োরি সম্পূর্ণ নয়। কোয়ান্টাম সিস্টেমের সম্ভাবনা কিভাবে ক্ল্যাসিকাল সিস্টেমে দাঁড়ায় সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বর্ন আর হাইজেনবার্গ বললেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখন সম্পূর্ণ। যা বাকি থাকে তা কেবল ব্যবহারের, প্রয়োগের। আইনস্টাইন একটি ছোট প্রশ্ন করে চুপ করে যান। প্ল্যাংক সারাক্ষণ নীরব ছিলেন। জগদীশ মেহেরা তাঁর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্তন গ্রন্থে চমৎকার দেখিয়েছেন কিভাবে এ সময়ে প্রবীণ ও নবীনদের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হয়েছিল। প্রবীণদের মধ্যে ছিলেন লোরেন্‌ৎস, প্ল্যাংক, সমারফেল্ড, আইনস্টাইন আর শ্রোডিংগার। নবীনদের মধ্যে ছিলেন হাইজেনবার্গ, ডিরাক, পাউলি, জর্ডান ও আরো অনেকে। ব্যতিক্রম বোর আর বর্ন, এঁরা মাঝবয়সী, এবং পুরোপুরি নবীনদের দলে। সাধে কি লর্ড র‍্যালে ১৯১৩ সালে বোরের পরমাণুর মডেল শুনে বলেছিলেন ষাট বছরের বেশি বয়সি লোকেদের আর এসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া উচিত নয়!

কিন্তু ঐ অক্টোবর ১৯২৭এর সলভে অধিবেশন থেকেই বোর-আইনস্টাইন বিতর্কের সূত্রপাত। পরদিন সকালে হোটেলের খাবার ঘরে আইনস্টাইনের প্রথন চিন্তন পরীক্ষা (থট এক্সপেরিমেন্ট) বার হলো। উনি বললেন একটি সরু ইলেকট্রন রশ্মি একটি ছিদ্রে আপতিত হলে তার পিছনের পর্দায় বিচ্ছুরণ প্যাটার্ন দেখা যায়। সেখানে দুটি ভিন্ন বিন্দুতে পতিত উজ্জ্বলতা নিশ্চয় দুটি আলাদা ইলেকট্রনের আপতন বোঝাবে। কিন্তু কোনও একটির আপতন নিশ্চিত হলে তখনই জানা যাবে সেটি অন্য বিন্দুতে পৌঁছয় নি। তাঁর মতে এই দুই বিন্দুর মধ্যে এরকম তৎক্ষণাৎ যোগসাধন (এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে) - খবর পৌঁছে যাওয়া - ইলেকট্রন বিন্দুদ্বয়ের কোনটিতে পৌঁছেছে - আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিরোধী। আবার তার আগে কম্পটন পরীক্ষায় দেখা গেছে এরকম দুটি ঘটনা নিখুঁতভাবে মাপা যায় সংবাদের তাৎক্ষণিক যোগ ছাড়াই।

এটা পরিষ্কার হলো বোর ও তাঁর অনুগামীদের দ্বারা। এখানে পুরোপুরি কার্যকারণ সম্পর্ক ঘটানো যায় না, সুতরাং তথ্যের অপ্রতুলতা থেকেই যায় কোনও ঘটনার ব্যাখ্যায়। এটা ক্ল্যাসিকাল কোনও ঘটনায় ঘটে না, এমনকি যেখানে (প্রচুর কণা - অণু পরমাণুর উপস্থিতির জন্য) ক্ল্যাসিকাল পরিসংখ্যান তত্ত্ব ব্যবহার করতে হয়। এটা কেবল কোয়ান্টাম জগতের ব্যাপার এবং সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে। ওরা দেখিয়েছিলেন যে আগেকার গাইগার-বোথে-কম্পটন পরীক্ষায় লব্ধ তথ্যের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নেই, কারণ সেখানে অবস্থান ও সময়ের মান সুনির্দিষ্ট করার জন্য শক্তি ও ভরবেগের মান নির্দিষ্ট থাকে না। এবার পরাস্ত হলেও আইনস্টাইন নিরস্ত্র হবার পাত্র ছিলেন না।

১৯৩০এর ষষ্ঠ সলভে অধিবেশনে তিনি সবার সামনে আরেকটি মানসিক পরীক্ষা দিলেন। মনে করা যাক বাঁ দিকের ছবির মত একটা যন্ত্র রয়েছে। স্প্রিং থেকে ঝুলন্ত বাক্সে একটি ফুটো আছে যেটি ইচ্ছামত খোলা বন্ধ করা যায়। বাক্সটি বিকিরণে ভর্তি। এভাবে বাক্সটি ওজন করা হলো (পাশে স্কেল রয়েছে)। এবার কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ফুটোটি এমনভাবে খোলা হলো যাতে একটিমাত্র ফোটন বার হতে পারে। কিছু পরে বাক্সটি

ওজন করে আমরা ঐ সময়ে ঠিক কতটা শক্তি বেরিয়েছে, জানতে পারি। তাহলে $\Delta E\Delta t$এর কোনও নিম্নতম সীমানা রইল না।

সারারাত ভেবে বোর এর জবাব দিলেন। ফোটনটি বার হবার পর ওজনের কাঁটা যখন কোনও ঘরে ফিরে আসে, সেখানে Δx সমান অনিশ্চয়তা ধরা যাক। ফোটনের পলায়ন বাক্সটিকে একটি ভরবেগ দেবে, যা আমরা মাপতে পারি Δp সমান অনিশ্চয়তা রেখে। এখানে $\Delta x\Delta p \sim h$ ধরা হলো। এখানে নিশ্চয় $\Delta p < tg\Delta m$, যেখানে t সময় লেগেছে কাঁটাটি কোনও নির্দিষ্ট ঘরে আসতে, g হলো মাধ্যাকর্ষণের দরুণ ত্বরণ আর Δm হলো ভর মাপার অনিশ্চয়তা। অতএব $tg\Delta m\Delta x > h$। যেহেতু ফোটন বার হলো, বোর একটি পরিচিত লাল-সরণ-সূত্র ব্যবহার করে বললেন যেহেতু ঘড়িটি হয় বাক্সে লাগানো নয়ত দর্শকের হাতে যার সাপেক্ষে একটি কণা আলোর গতিতে নির্গত হচ্ছে, সুতরাং সময়ের মাপে এখানে অনিশ্চয়তা থাকবে Δt পরিমাণ, যেখানে $\Delta t = \frac{1}{c^2} gt\Delta x$, c হলো আলোর গতি। অতএব $C^2\Delta m\Delta t = \Delta E\Delta t > h$। সুতরাং পুরনো লিমিট বজায় থাকছে।

১৯৩১ সাল থেকে আইনস্টাইন আর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অসঙ্গতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না, তার সম্পূর্ণতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ১৯৩০-৩১ থেকেই তিনি বলতেন যে এই নতুন তত্ত্ব সঠিক (অর্থাৎ তাতে কোনও অসঙ্গতি বা লজিকাল গণ্ডগোল নেই) কিন্তু অযৌক্তিক। এর অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্যগুলি তিনি পুরো মানতে পারতেন না, সেগুলি চিরকালীন সত্য বলে মেনে নেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই অবস্থায় ১৯৩৩ সালে তিনি জার্মানি ত্যাগ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন আর সেখানে প্রিন্সটনে আজীবন থেকে যান।

১৯২৭-২৮ থেকেই বোর বলতে শুরু করেছেন যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের কথাবার্তা বলি, কোয়ান্টাম জগতে তা করা যাবে না। বিশেষ করে কোনও ঘটনা (ফেনোমেনন) বলতে এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষাগারে যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিভাবে কোনও ঘটনা দেখা বা রেকর্ড করা হলো, তা বোঝাবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে কোনও পরীক্ষার রিপোর্ট আর কি। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এখন এই মতেই বিশ্বাসী। কিন্তু পরীক্ষাগারের বিশেষ অবস্থা, যন্ত্রপাতির সুনির্দিষ্ট অবস্থান প্রভৃতি ছাড়া ঘটনা বর্ণনা করা যায় না, এতে আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন না। তাঁর বাস্তব সত্য (অবজেকটিভ রিয়েলিটি) মত আমাদের বা দর্শকের অবস্থান ব্যতিরেকেও বস্তুর আলাদা অস্তিত্ব ধরে নেয়।

১৯৩৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত হলো বরিস পোডোলস্কি আর নেথান রোসেনের সঙ্গে আইনস্টাইনের ফিজিক্যাল রিভিউয়ে একটি গবেষণাপত্র, যেটি আলোড়ন তুলল। পেপারটির বক্তব্য এইরকম। ক ও খ দুটি কণা রয়েছে, যাদের প্রতিটির অবস্থান ও ভরবেগ জানা না থাকলেও সমগ্র ভরবেগ আর একটির সাপেক্ষে আরেকটির অবস্থান জানা আছে। এবার তাদের পরস্পরের ওপর কোনও ক্রিয়া করতে দেয়া হলো এমনভাবে যাতে ভরবেগ ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকে। আরও বেশ কিছু সময় পরে আমরা যদি মাপজোক করি, তাহলে ক-এর ভরবেগ মাপলেই খ-এর ভরবেগ জানা হয়ে যাচ্ছে, তাকে কোনোভাবে না দেখে বা ছুঁয়ে। তেমনই ক-এর অবস্থান জানলে সঙ্গে সঙ্গে খ-এর অবস্থানও জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ খ-এর ভরবেগ ও অবস্থান সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব হয়ে ওঠে। কিন্তু কম্প্লিমেন্টারিটি তত্ত্ব অনুযায়ী এই দুটি এক সঙ্গে বাস্তব হতে পারে না যতক্ষণ না কোনওভাবে তাদের একসঙ্গে মাপা হচ্ছে। পেপারে লেখা হলো 'বাস্তবতার কোনও যুক্তিপূর্ণ সংজ্ঞাতেই এমনটি হওয়া উচিত নয়'। এখানে আইনস্টাইনের স্থানীয় বাস্তবতা (লোকাল রিয়ালিটি)ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই EPR পেপারটির ফল হলো দুরকম। জুন মাসে শ্রোডিংগার আইনস্টাইনকে লিখলেন, আপনি আসল সমস্যার জায়গাটি ধরেছেন। আইনস্টাইন উত্তরে লিখলেন, 'একমাত্র আপনার সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়, পরিসংখ্যান (বা বর্ন ব্যাখ্যায়) ψ কোনও একটি বস্তুর বা সিস্টেমের হতে পারে না, এটি একটি ensemble মাত্র হতে পারে, আপনি এই অসম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করেন না, ψএর বাস্তবতায় বিশ্বাস করেন'। ইত্যাদি। পাউলি ঐ সময়েই হাইসেনবার্গকে লিখলেন, 'আইনস্টাইন আবার কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে মুখ খুলেছেন, আর যখনই তা করেন তখনই সর্বনাশ হয়'। অর্থাৎ সাধারণ বিজ্ঞানীরা ধাঁধায় পড়েন। আইনস্টাইন আরও বলেন যে শ্রোডিংগারের ψএর বাস্তবতা কিন্তু সমস্যার সমাধান নয়। এক বস্তা গানপাউডার ফেলে রাখলে সেটা বছরখানেক পরে ফাটবে কি না সেটা পূর্ববর্তী ψ (যেটা ফাটা ও না-ফাটা অবস্থার উপরিপাত) থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।

কোপেনহাগেনে খবর পৌঁছতেই বোর ও তাঁর দলবল সব কাজ ফেলে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। দেড়মাস পরে উত্তর এল। কণার ঘূর্ণন অথবা গানপাউডারের বিস্ফোরণ পরীক্ষাসাপেক্ষ। যে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, তাতেই উত্তর তৈরি হচ্ছে (অর্থাৎ কণার ঘূর্ণন আছে কি না, তা একদিকে না অন্যদিকে, বিস্ফোরণ হয়েছে কি না)।

ই পি আর গবেষণাপত্রের সাপেক্ষে শ্রোডিংগার ১৯৩৫এ একটি পেপার লিখলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বর্তমান অবস্থা নিয়ে। উনি বললেন বিজ্ঞানীরা তথ্য থেকে মডেল তৈরি করেন ঠিকই, কিন্তু কোয়ান্টাম জগতে সব চলকের সঠিক তথ্য একসঙ্গে পাওয়া যায় না। এর কারণ, অনিশ্চয় তত্ত্ব। তা সত্ত্বেও ψ ঐ মডেলের অবস্থা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেয়। চলকেরা কি সত্যিই আবছা, ধোঁয়া ধোঁয়া? কোয়ান্টাম জগতে নিশ্চয়, কিন্তু যখন আমাদের ধরা ছোঁয়ার জগতের বস্তু নিয়ে কথা বলি সেখানে ঐ ভাব থাকতে পারে না। এইবার তাঁর কল্পিত বেড়াল ঝুলি থেকে বার হলো।

নিচের ছবির কথা চিন্তা করা যাক। একটি চারদিক বন্ধ ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটি গাইগার কাউন্টার জাতীয় যন্ত্র আছে, যার মধ্যে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে। ঐ যন্ত্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা কণা বার হলেই তৎক্ষণাৎ সামনের একটি লিভার জাতীয় যন্ত্র ওপর থেকে নিচে পড়ে যাবে, তা পড়লেই নিচের দড়িতে বাঁধা হাতুড়িটি নিচের ফ্লাস্কের গায়ে আছড়ে পড়বে। ফ্লাস্কের মধ্যে প্রুসিক অ্যাসিড জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেটি ফ্লাস্ক থেকে বাইরে এলেই বন্ধ ঘরের মধ্যে একমাত্র প্রাণী, একটি বেড়াল, মারা পড়বে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধ-জীবন (হাফ লাইফ) ধরা যাক এরকম যে তা থেকে এক ঘণ্টায় একটি কণা বা বিকিরণের ফোটন নির্গত হবার সম্ভাবনা অর্ধেক ($^1/_2$)। এমতাবস্থায় পরীক্ষার

শুরু থেকে একঘণ্টা পরে বেড়ালটি জীবিত থাকবে না মৃত?

কোয়ান্টাম তত্ত্ব (তৎকালীন ও এখনকার, বোর বর্ন প্রভৃতিরা যার ব্যাখ্যা যা করে গেছেন তার এখনো কোনো পর নেই) বলে যে পরীক্ষা ব্যতিরেকে একঘণ্টা বাদে বেড়ালটির তরঙ্গ-ফাংশন, যা বেড়ালটি সম্বন্ধে সব প্রয়োজনীয় তথ্যই আমাদের দিতে পারে, এইরকম হবে -

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\ \psi_{\text{জীবিত}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\ \psi_{\text{মৃত}}$$

যাতে করে বেড়ালটি জীবিত থাকার সম্ভাবনা সমান সমান বেড়ালটি মৃত থাকার সম্ভাবনা ..। শ্রোডিংগার তাঁর পেপারে বলেন যে অনিশ্চয়তার তত্ত্ব এই প্রস্তাবিত পরীক্ষায় পরমাণুর জগৎ থেকে আমাদের বাহ্যিক জগতে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানে আর ধোঁয়া ধোঁয়া ছবি দেখানো চলবে না। পরিষ্কার বলতে হবে উত্তর কি।

১৯৩৬এর মার্চ মাসে শ্রোডিংগার আইনস্টাইনকে লিখলেন, 'কিছুদিন আগে লন্ডনে বোরের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটানো গেল, বোর তাঁর নম্র ভদ্র স্বভাবেও বারবার বললেন তিনি আতঙ্কিত আছেন, আমার আর ফন লাউএর এবং বিশেষ করে আপনার, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিরুদ্ধে এরকম আঘাত করা তিনি বিশ্বাসঘাতকতা মনে করছেন। বিশেষত যখন তাই স্বাভাবিক, এবং পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত। ওঁর মতে আমরা যেন প্রকৃতিকে আমাদের 'বাস্তবতা' মেনে নিতে বাধ্য করছি'। যথারীতি, এর উত্তর এল যে শ্রোডিংগার পরীক্ষকের অস্তিত্বই যেন অস্বীকার করছেন। পরীক্ষা হলে বেড়ালটি যে হয় জীবিত থাকবে নয় মৃত থাকবে (ঠিক একঘণ্টা পরে) সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। আর প্রারম্ভিক অবস্থা (ইনিশিয়াল স্টেট) যদি যথার্থই একটি বিশুদ্ধ দুই স্টেটের উপরিপাত হয়, তবেই বেড়ালটি অর্ধমৃত থাকবে (একঘণ্টা বাদে)। প্রারম্ভিক স্টেট যদি অবিশুদ্ধ বা মিশ্র-অবস্থার হয়, তাহলে পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির কারণে দুটি সম্ভাবনার কোনও একটি আগেই প্রাধান্য পেয়ে যাবে।

এই শেষ বিষয়টি অর্থাৎ বিশুদ্ধ দুই বা ততোধিক স্টেটের উপরিপাতে গঠিত কোনও নতুন স্টেট (বা ψ) অথবা ঐ ধরনের একাধিক স্টেটের অবিশুদ্ধ মিশ্রণ, এ নিয়ে বিস্তর কাজ হয়েছে গত কয়েক দশক ধরে। এখনও হচ্ছে। মিশ্র-অবস্থা আর উপরিপাত অবস্থা, সময়ের সঙ্গে দুটির পরিবর্তন দুরকম। যদি পারিপার্শ্বিকের কোনও প্রভাব না থাকে, অর্থাৎ সিস্টেম দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বাধীনভাবে থাকে, উপরিপাত অবস্থা ঐ রকমই থেকে যাবে। মিশ্র-অবস্থা কিন্তু তার উপাদান স্টেটগুলিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণত সময়ের সঙ্গে এই বিবর্তন পরীক্ষা করতে হয় কোনও না কোনওভাবে সিস্টেমের সঙ্গে কোনও তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের সংস্পর্শ ঘটিয়ে তার ফল কি হয় সেটা দেখে। সেক্ষেত্রে মিশ্র-অবস্থার বিশ্লেষণ চট করে বোঝা যায়। উপরিপাত অবস্থা তার আসঞ্জনতা হারাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নেয়, তাকে বলে অনাসঞ্জনতা-কাল (ডিকোহেরেন্স টাইম)। সুতরাং ই পি আর সমস্যা বা শ্রোডিংগারের বেড়াল সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে উভয় ক্ষেত্রে দুটি অবস্থার উপরিপাত কিভাবে একটিমাত্র পরিস্থিতিতে অনাসঞ্জিত হচ্ছে, তার মধ্যে।

এখন দেখা যাক এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কতরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমরা বিজ্ঞানী মহলের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব, যদিও কিছু জায়গায় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের ধারণা মিশে থাকবে। সাধারণ মানুষ, যারা সবজি বাজার মাছের বাজার কিংবা শেয়ার বাজারের দামের ওঠাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বা ছোট বড় পর্দায় বিভিন্ন ধরনের বসনে ভূষিত ব্যক্তিদের অথবা মাঠ ময়দানে বিভিন্ন ধরনের নেতা বা খেলোয়াড়দের নানাবিধ ব্যায়ামকৌশল দেখে মত্ত থাকেন, তাদের কাছে কোয়ান্টাম জগৎ যে সম্পূর্ণ অবাস্তব তা বলাই বাহুল্য। আইনস্টাইনের নাম এরা অনেকেই শুনেছেন, নীলস্ বোরের নামটিও স্মৃতিপটে আঁচড় রেখে যেতে পারে, তবে ওই পর্যন্তই। আবার, মজার কথা, বিজ্ঞানী মহলেও যে এরকম মানুষ নেই তা নয়, বরং বেশির ভাগই এ ধরনের। ধরে নেন, কোনওরকমভাবে কোয়ান্টাম জিনিসপত্র ক্ল্যাসিকাল আকার ধারণ করে। কি করে, ঠিক কোন চেহারায় তা জানবার দরকার নেই। কাজ হলেই হলো। এই রকম ধারণা শুধু এদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, সব দেশে সব কালেই ছিল, রয়েছে, থাকবে।

কিছু লোকে বলেন যে দেখার যে সীমা বেঁধে দিচ্ছে হাইজেনবার্গের নিয়ম, অর্থাৎ দুটি পরস্পরের পরিপূরক চলক যদি আমরা মাপতে যাই তাহলে দুটি নিখুঁতভাবে একসঙ্গে মাপা যায় না এই নীতি, পরীক্ষার মধ্যে পরীক্ষকের বা দ্রষ্টার ভূমিকা বড় করে দেখাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ফন নয়ম্যানের দ্রষ্টা-দৃশ্য-পরীক্ষা-সংক্রান্ত কূট সমস্যা এসে পড়ে। তা হলো দ্রষ্টা বা পরীক্ষককেও পরীক্ষা যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে ধরতে হয়। সে ক্ষেত্রে দ্রষ্টার মনকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না পরীক্ষার হিসেব থেকে।

প্রাচীনকাল থেকে শরীর-মন, বা দ্রষ্টা-দৃশ্য নিয়ে দর্শনশাস্ত্রে যে সমস্যা ছিল, সে ব্যাপারে দেকার্তের উক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। তাঁর সময় থেকে পাশ্চাত্য দর্শনে শরীর আর মন এ দুটির বর্গ বা অবস্থান আলাদা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। আদর্শবাদী ও বস্তুবাদীরা যথাক্রমে মন ও শরীর নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত বলে দাবি করতে থাকেন। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে হয় নি তা নয়, বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই, বিশ শতকেও। তবে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব, পজিটিভিস্ট ও বাস্তববাদীদের প্রতিপত্তি সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে এখন বাস্তববাদী তথা বস্তুবাদীদেরই জিৎ। গত শতকের মধ্যভাগে পজিটিভিস্ট প্রভাবে গিলবার্ট রাইল বললেন শরীর, মন দুয়ের সত্ত্বা দুরকম(একটি বাস্তব, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। অন্যটি সেই অর্থে 'আছে' বলা যাবে না। তখন থেকে এটিই হলো 'অফিশিয়াল' মতবাদ, মন নিয়ে। অথচ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রথম দিকে, এডিংটন প্রমুখ অনেক নামকরা বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন এবারে, বিশেষ করে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয় তত্ত্বের পরে, শরীর মনের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ মিলিয়ে যাবে।

এখানে ফ্রি-উইল বা স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ে একটা বড় সমস্যা ছিল। শরীরের সঙ্গে মনও যদি বাস্তব হয়, তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা থাকতেই পারে। কিন্তু মন যদি বাস্তব কিছু না হয় তাহলে আমাদের চিন্তারা কি পুরোপুরি বাহ্যিক বা শারীরিক কিছু প্রক্রিয়ার অধীন? 'শরীর, শরীর - তোমার কি মন নাই কুসুম' - এই আর্তি আমাদেরও অর্থাৎ যারা মনকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারি না। বর্তমান স্নায়ুতন্ত্র-গবেষকদের অধিকাংশই মনে করেন মন মস্তিষ্কের কিছু তড়িৎ-রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র, ক্যাট-স্ক্যান, পেট বা এফ এম আর আই সিগন্যাল সমষ্টি যার আরেক চেহারা। এ বিষয়ে গবেষণা জোরকদমে চলছে, শেষ কথা বলা বা শোনার এখনও ঢের দেরি। তবে আসল সমস্যা মনে হয় অন্য জায়গায়। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা যে দুটি খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে তা হলো ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর স্বাধীন ইচ্ছা। একদিক থেকে দেখলে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি চিন্তা করা যায় না। স্বাধীন ব্যক্তিই কেবল স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। অন্যভাবে দেখলে যিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন, তিনিই স্বাধীন। প্রথম ক্ষেত্রে শরীর মনের ঘনিষ্ঠ যোগ ধরে নেয়া হচ্ছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আলাদা করে না দেখলে বোঝা মুশকিল। এখন ব্যক্তি স্বাধীনতা বা আরও ভাল করে বললে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর স্বাধীন ইচ্ছা, এ দুটির সঙ্গে আধুনিকতম বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিরোধ বাধল বলে। শেষোক্ত লোকেরা বলেন পার্থিব অপার্থিব সব কিছু বিজ্ঞানের নীতি মেনে চলে, না চললে জোর করে মেনে চালানো হবে। তার জন্যই ক্লোনিং বা স্টেম কোষ গবেষণার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল, ধর্মভীরু গোষ্ঠিগুলির এত আন্দোলন।

আবার কোয়ান্টাম জগতে ফিরে আসা যাক। নামকরা নোবেলজয়ী পদার্থবিদ ইউজিন ভিগনার বলতেন যতক্ষণ না কেউ কোনও যন্ত্রের কাঁটা কোনখানে আছে সেটা দেখছে, ততক্ষণ মাপজোক করা হয়েছে কি না বলা যাবে না। অর্থাৎ চেতন পরীক্ষক বিনা কোনও পরীক্ষা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, একাধিক সম্ভাবনাযুক্ত কোনও কোয়ান্টাম অবস্থায় যখন পরীক্ষকের প্রবেশ হলো, তার চৈতন্য যে বিশেষ স্টেটটি দেখল বা খুঁজে নিল তা যেন উল্টে ঐ সব অবস্থার উপরিপাত থেকে একটি বিশেষ স্টেটে অকস্মাৎ সংকোচন (কোল্যান্স) ঘটাচ্ছে। এ ব্যাপারে পরে আরও বলা যাবে।

একদল লোক মনে করেন কোয়ান্টাম জগতে মাপজোক মানেই পরিসংখ্যান। সেখানে আলাদা কোনও বিশেষ স্টেটে পরীক্ষা করা হচ্ছে না, তা সম্ভবও নয়। আসলে অনেকগুলি স্টেটের ওপর পরীক্ষার মিলিত ফল দেখি আমরা। সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম মেনে তাই গড়, সম্ভাবনা ইত্যাদির ফর্মুলা খাটে এখানে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রায় সমবয়সি স্ট্যাটিসটিকাল মেকানিক্সে গিবসের তত্ত্বানুযায়ী বলা যায় অনেকগুলি বিশেষ স্টেটের উপরিপাতে তৈরি কোনও একটি স্টেটে পরীক্ষার ফল যেন ঐ সাধারণ স্টেটের অনেকগুলি কপির সমষ্টি (ensemble)র ওপর পরীক্ষার ফলের সঙ্গে সমান। আইনস্টাইন নিজে এই গিবসীয় এনসেম্বল ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। বলেও গেছেন যে এই এনসেম্বল দিয়ে কোয়ান্টাম অবস্থায় মাপজোকের ব্যাখ্যাই হলো ঐ জগতে মাপজোকের আসল ব্যাখ্যা।

এ ছাড়া কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রথম যুগে আইনস্টাইন বারবার বলেছেন যে এই মেকানিক্স সম্পূর্ণ নয়। এর মধ্যে আরও তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। সেই থেকে এসেছিল লুকানো চালক তত্ত্ব বা হিড্‌ন্ ভেরিয়েবল থিয়োরি। তবে কেমন হবে এই থিয়োরি তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে ঐক্যমত্য বিশেষ দেখা যায় নি। আইনস্টাইন নিজে বাস্তব সত্য যে দ্রষ্টানিরপেক্ষ এই মত পোষণ করতেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা যদি আকাশে চাঁদকে না দেখি তাহলে কি তার অস্তিত্ব থাকে না? আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে জড়জগত, যা কোয়ান্টাম জগতের থেকে আকারে বড় সমস্ত কিছুর সমষ্টি (যার মধ্যে ব্যক্ত বা পরিস্ফুট আকারে কোয়ান্টাম প্রভাব থাকতে পারে, যেমন নিউট্রন তারকা) অর্থাৎ যা আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব মেনে চলে, সেখানে স্থানীয় বাস্তবতা বা লোকাল রিয়ালিজম কাজ করে। যেখানে অদ্ভুত কিছু দেখা যায়, যেমন কৃষ্ণ গহ্বর, সেখানেও সব কিছু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব মেনেই ঘটে।

কিন্তু কোয়ান্টাম কণা এর মধ্যে এসে গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়। কিছু উদাহরণ তো আগেই দেখা গেছে। মনে করা যাক কোনও মহাজাগতিক ফোটন, সূর্য থেকে যা আকছার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, পৃথিবীতে আসছে, তবে বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই শোষিত হয়ে যায়, তা পথে কোনওখানে একটি কণা ও তার বিপরীত কণায় ভেঙে গেল। এই জুড়ির কোনওটি যদি পৃথিবীতে এসে পড়ে, তাহলে যে ফোটন এদের জন্ম দিয়েছে তার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকলে তৎক্ষণাৎ অন্য কণাটির ধর্ম বলে দেয়া যাবে - সেটি তখন চাঁদ কি মঙ্গল গ্রহ কি যেখানেই থাকুক। এখানে দুটি কণার ধর্ম নির্ণয় করার সময় একটি থেকে আরেকটিতে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে, স্থানীয় বাস্তবতা নীতি অনুযায়ী যা সম্ভব নয়।

কোয়ান্টাম সিস্টেম যখন আলাদা করে দেখি তখন মাপজোক নেয়া হলেই স্টেট কোনও একটি বিশেষ স্টেটে সংকুচিত হচ্ছে। ধরে নেয়া গেল সিস্টেমের সঙ্গে তার বহির্জগতের মিথস্ক্রি(য়ার ফল এই সংকোচন, যদি ক্রিয়াটি আমরা ঠিকমত নাও বুঝতে পারি। কিন্তু সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি আমার সিস্টেম ধরি, তার বাইরে তো কিছু থাকতে পারে না। কোয়ান্টাম বিশ্বতত্ত্ব এভাবেই দেখা হয়। তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি আমার কোয়ান্টাম সিস্টেম হয়, সেখানেও বিভিন্ন বিশেষ স্টেটের উপরিপাত অবস্থা থাকতে পারে। এই ব্যাপারে এভারেট প্রস্তাব দেন ১৯৫৭ সালে যে, যখনই কোনও পরীক্ষা করা হয়, তখনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেকগুলি কপি তৈরি হয়ে যায়, ঠিক স্টেটের মধ্যে যতগুলি বিশেষ স্টেট রয়েছে, ততগুলি। প্রথমদিকে এভারেট বলতেন যে, জগতের ইতিহাসে যেন শাখাপ্রশাখা তৈরি হয়ে যায় প্রতিটি পরীক্ষার সঙ্গে (যেখানে একাধিক সম্ভাবনা থাকে, স্টেটের মধ্যে কোন বিশেষ স্টেটে সংকোচন ঘটবে, সেই রকম)। পরে, তত্ত্বগত সুবিধার জন্য, ধরে নেয়া হলো বিশ্বের অসংখ্য কপি রয়েছে। যখনই পরীক্ষা ঘটছে কোনও, পরীক্ষক কোনও একটি সম্ভাবনার জগতে পৌঁছে যাচ্ছেন তৎক্ষণাৎ। অথবা বলা ভাল জগতের সঙ্গে সঙ্গে তারও তো প্রতিমূর্তি রয়েছে প্রতি জগতে - সেই বিশেষ সম্ভাবনার বিশেষ জগতের পরীক্ষক বিশেষ ফলটি দেখছেন, টুকে রাখছেন খাতায়। আমরা মনে করছি অনেকগুলি সম্ভাবনার সংকোচন ঘটল।

যে সমস্যা নিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা অর্থাৎ ঐ বেড়াল জাতীয় প্রাণী জীবিত না মৃত, সেই সমস্যার সমাধান হয় একরকম এই বহুবিশ্ব মতে। কিন্তু একটি জগতকেই আমরা ঠাউরে উঠতে পারি না, তায় তার অনেকগুলি নকল, মিথ্যা, মায়া! এমতের সমর্থকরা, যেমন ডিউইট, ডয়েশ প্রভৃতিরা অবশ্য মনে করেন এই মত ঠিক কি না তা বুদ্ধিমান কম্পিউটার থাকলে বলে দেয়া যাবে। অর্থাৎ কোন জগতে বেড়ালটি মৃত তা সেই জগতের কম্পিউটারে ধরা পড়বে, যাকে অন্য কম্পিউটার থেকে পৃথক বলেও জানা যাবে।

আবার যদি বাস্তব জগতে ফিরে আসার কথা ভাবি, তাহলে ভৌত বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা যদি সত্য হয় (এখনও পর্যন্ত কোয়ান্টাম জগৎ এবং মহাজগতের কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছাড়া যা সম্পূর্ণভাবে সত্যি) তাহলে বলতে হয় বস্তুদের (পদার্থ এবং ক্ষেত্র) দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদির বাইরে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। শুধু তাই নয়, তারা বেশির ভাগই দেশ কালে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত এবং তার জন্যই আলাদা অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমাদের কাছে। এর সঙ্গে দুটি অতি দূরবর্তী বস্তু যে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং এদের কোনও একটির দর্শন, স্পর্শন ইত্যাদি যে অন্যটির কোনও প্রভাব ব্যতিরেকে ঘটবে সেটা আমরা সহজে মেনে নিই। আমাদের বাহ্যিক জগৎ থেকে মহাজগৎ পর্যন্ত এই দুই অভিজ্ঞতা - বিশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষমতা আর লোকাল বাস্তবতা - আমাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়েই থাকে।

এই বাস্তবতার ধারণা যদি সত্যিসত্যিই আমাদের সহজাত বোধ হয়, তাহলে পুরোপুরিভাবে আইডিয়ালিজমের দিকে আমরা ঝুঁকতে পারি না। সত্যিই তো, হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব, তার ওপর ভিত্তি করে বাড়ি-ঘর, গাড়ি, জাহাজ, রকেট বানাব, তেল-সাবান বানাব গায়ে মাখার জন্য, এমনকি বন্দুক প্রাণহত্যার জন্য, তেমনি গোলাগুলি, পরমাণু বোমা তৈরি করব, তারপর বলব - 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'! সেদিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি - এ সংসার মজার কুটি - বোধহয় সত্যিকার বিজ্ঞানীর মনের কথা। সংসার তার কাছে 'ধোঁকার টাটি' হলে তার প্রফেশনটাই মাটি হতো। বরং স্বামী তুরীয়ানন্দেরর শেষ উক্তি - ব্রহ্ম সত্যং, জগৎ সত্যং, জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিতম্ - এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের অনেক সহায়ক, যদিও তাঁর উক্তির প্রথম ও শেষ অংশটুকুর সত্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা বিজ্ঞানের হাতে আসে নি। আর্ষদর্শনের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন যে সাংখ্যদর্শন, সেখানেও জড় জগতকে আলাদা সত্ত্বা ধরা হয়েছে, অর্থাৎ তার ধর্ম, বিবর্তন ইত্যাদি চেতন জীব থেকে আলাদা।

এই কথাগুলির মানে হলো কট্টর ভাববাদীদের, যেমন ভিগনার, ফন নয়ম্যান প্রমুখ যারা পরীক্ষকের চেতনাকে পরীক্ষাযন্ত্রের অংশ হিসেবে মনে করেন, তাদের আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে পারি। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই কোয়ান্টাম বাস্তবতার বিতর্ক যে স্তরে চলেছিল সেখানে কেবল তাত্ত্বিক মডেল ধরে আলোচনা ছাড়া কোনও পথ ছিল না। যার জন্য ভাববাদীরা, এবং তথাকথিত লুকনো চলক তত্ত্বগুলি গুরুত্ব পাচ্ছিল। ১৯৬৪ সালে জন বেল প্রথম দেখালেন যে লোকাল বাস্তবতা মেনে নিলে আমরা পরীক্ষা করার মত অবস্থায় পৌঁছতে পারি যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের (অর্থাৎ বোর, বর্ন প্রভৃতির মত বা কোপেনহাগেন ব্যাখ্যা) ভবিষ্যৎবাণী সঠিক কিনা দেখা যাবে। ধরা যাক মাঝের বাক্সটিতে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে যেখানে কোনওভাবে একটি সিংশ্লেট স্টেট ভেঙে দুটি ইলেকট্রন বা ঐ জাতীয় কোনও কণা দুদিকে যাচ্ছে। সিংশ্লেট অবস্থা হলো যেখানে ইলেকট্রন জাতীয় কণার ঘূর্ণন বা স্পিন দুটি বিপরীত অর্থাৎ একটি 3 হলে অন্যটি 1। অতএব দুটি পরিদর্শক A ও B এর মধ্যে A যদি প্রাপ্ত কণার স্পিন 1 দেখে, Bকে তার কণার স্পিন 3 দেখতেই হবে। বেল দেখালেন যে লোকাল বাস্তবতা ধরলে EPR-এর মত এখানে বলতে হয় A ও B এর স্পিন মাপার ফল পূর্বনির্ধারিত। সেখান থেকে উনি বিভিন্ন স্পিন দেখার সম্ভাবনার মধ্যে একটি অসমতা (বেল্‌স্ ইনইকুয়ালিটি) রয়েছে, তা দেখান। বেল আরও দেখান এই অসমতা সরাসরি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধী। একে বেলের প্রতিপাদ্য (বেল্‌স্ থিয়োরেম) বলে। এখানে বলে রাখা ভাল, আমরা দুটি ইলেকট্রনের জায়গায় দুটি ফোটনের কথাও ভাবতে পারি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের A ও Bর জায়গায় অ্যালিস ও বব বলা হয়ে থাকে।

তবে প্রথম সংস্করণে বেলের প্রতিপাদ্য বা অসমতা কিছুটা সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে ক্লাউসার, হর্ন, শাইমনি আর হোল্টএ ব্যাপারে আরও সাধারণ কতকগুলি অসমতার সম্বন্ধ দিলেন, এগুলিকে CHSH অসমতা বলে। এগুলির পরীক্ষা আরও সহজ বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষা আরম্ভ হলো। ১৯৭০এর দশক থেকে এ পর্যন্ত যত পরীক্ষা হয়েছে তাতে বেল (বা CHSH) অসমতাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভবিষ্যৎবাণী নয়। অর্থাৎ আইনস্টাইনের স্থানীয় বাস্তবতা নীতি কোয়ান্টাম জগতে খাটে না। এখানে ঐ দুটি কণা যেন জন্ম থেকেই পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (এন্ট্যাংগল্‌ড্) থাকে।

ইতিমধ্যে আরও পরীক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। EPR এবং বেল (বা CHSH) জাতীয় পরীক্ষায় যদি দুটি সংশ্লিষ্ট কণার ধর্ম (স্পিন ইত্যাদি) নিয়ে পরীক্ষা করি, তাহলে অন্য পরীক্ষায় তাদের দৈশিক অবস্থান বা পথ নিয়ে পরীক্ষা করার কথা ভাবতে পারি। বাঁ দিকে কোনও ধরনের কোয়ান্টাম কণার উৎস রয়েছে, সেখান থেকে নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (যেগুলি আমাদের আলোচ্য নয়) একটি কণারশ্মি নির্দিষ্টভাবে প্রথম পর্দায় পড়ছে। এই পর্দায় খুব কাছাকাছি দুটি ছিদ্র রয়েছে, ক ও খ (বোঝার সুবিধার জন্য বড় করে দেখানো হয়েছে)। এখন কণাগুলি এর পরে আরেকটি পর্দায় আপতিত হচ্ছে মনে করি। এবার ডানদিকে দ্বিতীয় পর্দায় কিরকম ছবি পাওয়া যেতে পারে দেখানো হলো। যদি কোনও একটি ছিদ্র বন্ধ থাকে তাহলে ছবির ধরন (প্যাটার্ন) দুটি ছিদ্র খোলা থাকলে যা হয় তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বলে রাখা ভাল একেবারে ডানদিকে পাওয়া ছবিটি বহু আগেই দেখা গেছে, যদি আমরা কোয়ান্টাম কণার জায়গায় আলোকরশ্মি চিন্তা করি। সেই পরীক্ষাকে বলে ইয়ং-এর দ্বিছিদ্র (ডাবল্ স্লিট) পরীক্ষা এবং প্রাপ্ত প্যাটার্ন, যেটা একেবারেই একদম ডানদিকের ছবির মতন, তাকে বলে ব্যতিচার (ইন্টারফিয়ারেন্স) প্যাটার্ন।

আবার কঠিন বস্তুকণা যেমন বুলেট নিয়ে পরীক্ষা করলে, অর্থাৎ তার একটি স্রোত বা রশ্মি বানিয়ে সেটাকে প্রথম পর্দায় ফেললে প্রথম ছবিটি একরকম থাকবে। অর্থাৎ একটি করে ছিদ্র বন্ধ রাখলে বুলেটের স্রোত প্রথম ডানদিকের ছবির মত প্যাটার্ন তৈরি করবে। কিন্তু দুটি খোলা রাখলে

একদম ডানদিকে পাওয়া যাবে ঐ দুটি আলাদা প্যাটার্নের সমষ্টি, অর্থাৎ এইরকম একটি ছবি।

এইরকমই ভেবেছিলেন হুইলার ও আরও কয়েকজন। প্রথমে যখন এটি একটি আইডিয়া মাত্র ছিল, তখন কোয়ান্টাম কণার রশ্মির ক্ষেত্রে একদম ডানদিকের প্যাটার্নের ব্যাখ্যা হলো কণা যদিও বুলেটের মত আলাদা আলাদা 'বস্তু' বলে আমরা মনে করি, তরঙ্গের সঙ্গে তার দ্বিচারিতা সম্পর্কের জন্য সে ঠিক বুলেটের মত দেখাবে না। ডিরাক তো বলেই বসলেন যে, এক্ষেত্রে কোনও কণার পথ বলে কিছু আলাদা করে দেখানো যাবে না। যখন দুটি ছিদ্র খোলা রয়েছে, তখন কোনও কণা 'ক' দিয়ে নির্গত হয়ে আবার 'খ' দিয়ে ফিরে আসতে পারে। এইরকম আর কি। এই ধরনের পরীক্ষাতেও এখনও পর্যন্ত কোয়ান্টাম কণা, এমনকি অণু পরমাণু দিয়ে তৈরি স্রোত বা রশ্মির ক্ষেত্রে ব্যতিচার প্যাটার্নই দেখা গেছে।

এই পরীক্ষার আরেকটি সংস্করণ হলো অন্য ধরনের ব্যতিচারক যেমন মাখ-জেন্ডার ব্যতিচারক। এখানে কণার উৎস থেকে নির্গত রশ্মি এসে 'ক' আয়নায় পড়ছে, যেটি তার ওপর আপতিত রশ্মির অর্ধেকটি প্রতিফলিত করে, অর্ধেকটি সোজা (অর্থাৎ যেভাবে আপতিত হয়েছে সেভাবে) আয়নার ভিতর দিয়ে চলে যায়। 'ক'এ প্রতিফলিত রশ্মি 'গ' আয়নায় পড়ে পুরো প্রতিফলিত হয় এবং সোজা Bপরিদর্শকের কাছে পৌঁছয়। 'ক'এর ভিতর দিয়ে যাওয়া রশ্মি 'খ' আয়নায় পুরো প্রতিফলিত হয়ে Aপরিদর্শকের কাছে পৌঁছয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অনুযায়ী, যদি একটি কণাও 'ক' আয়নায় আপতিত হয়, তবে তা A ও B দুজনের দ্বারাই দৃষ্ট হবে অর্থাৎ তার আগে P অঞ্চলে ব্যতিচার দেখাবে।

এই ধরনের পরীক্ষাও হয়েছে এবং যথারীতি এন্ট্যাংগ্‌লড্‌ অবস্থাই অর্থাৎ ব্যতিচারই দেখা গেছে। এক্ষেত্রে বলা উচিত, ঠিক একটি কণা নিয়ে পরীক্ষা বিগত দুয়েক বছরেই সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে। প্রতি ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই জয়জয়কার।

এর মধ্যে হুইলার এবং অন্যান্যরা আরেকটি জটিলতার সৃষ্টি করেন। মনে করা যাক আমরা জানি যে কণাটি 'ক' নামক আয়না পার হয়ে গেছে, হয় 'খ' এর দিকে, নয়ত 'গ'এর দিকে। সেই মুহূর্তে Pতে আরেকটি আয়না বসিয়ে দেয়া যায়, যেটা কোনও বিশেষ দিকের থেকে আগত সিগন্যালকে অল্প পরিবর্তিত করে দিল। তাতে ব্যতিচারের তফাৎ ঘটবে, A ও B দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের হেরফের হবে। একে বলে দেরিতে পছন্দ করার পরীক্ষা (ডিলেইড চয়েস এক্সপেরিমেন্ট)। ১৯৮০র দশক থেকে এ ধরনের পরীক্ষাও করা সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ব্যতিচারের কোনও ব্যভিচার জ্ঞাত হয় নি।

এই প্রসঙ্গে বেড়ালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আরও গোটা তিনেক বক্তব্য উল্লেখ করা উচিত। উচিত এ কারণেও যে এই সমস্যার বা রহস্যের সমাধানের বীজ হয়ত এই তিনের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে।

প্রথমটি ঐতিহাসিক কারণে সবচেয়ে পুরনো। দ্য ব্রয়লি, আইনস্টাইন এবং বেশ কিছু পরিমাণে শ্রোডিংগারও এর জনক। তবে ডেভিড বোম ১৯৬৭ সালে প্রসঙ্গটা না তুললে হয়ত ব্যাপারটা চাপা পড়েই থাকত। দ্য ব্রয়লি যখন পদার্থ-তরঙ্গ এই নিয়ে দোদুল্যমান তখন তিনি (দ্য ব্রয়লি) একসময়ে বলেছিলেন যে, এই কোয়ান্টাম জগতে তথ্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছতে পারে আলোর চেয়েও তাড়াতাড়ি। যেন আসল তথ্য (যেমন তথ্যবাহী কোনও কণা, ফোটনের মত) গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগে তার পোটেনশিয়াল তার আগে আগে সেখানে পৌঁছে যায়। আইনস্টাইন পরে অন্যত্র লেখেন যে এর ফলে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের বাঁধন কাটিয়ে কিছুটা উনিশ শতকের ক্ল্যাসিকাল ধাঁচে দুটি পরিস্থিতির উপরিপাত থেকে কোনও একটি সিদ্ধান্তে নিশ্চিতভাবে আসা সম্ভব। বোম প্রথম এই তত্ত্বকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। কিভাবে ঐ পোটেনশিয়াল, যার নাম এখন দ্য ব্রয়লি-বোম পোটেনশিয়াল (কেউ কেউ শুধু বোম-পোটেনশিয়াল বলেই উল্লেখ করেন), বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে কোনও একটিকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে, তাও বোম এবং তাঁর সহকর্মী ও ছাত্ররা দেখিয়েছেন। এঁদের মতে এই ব্যাখ্যার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো, এতে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে অতিরিক্ত তাত্ত্বিক বোঝাগুলো, যা এই বেড়াল সমস্যায় ধরে নিতে হয় (যেমন এভারেটের বহু-বিশ্ব মত), ঝেড়ে ফেলে দেয়া যায়।

তত্ত্বগতভাবে এই মতের বিপক্ষে বলা যায় যে উনিশ শতকের ক্ষেত্র (ফিল্ড) সম্পর্কীয় ধারণা যেন কোয়ান্টাম তত্ত্বে ফিরিয়ে আনা হলো। আর কণা বা তরঙ্গ নিয়ে দ্বন্দ্ব নয়, মূলে থাকল কেবল ক্ষেত্র। অর্থাৎ কণা-তরঙ্গ বিতর্কের আগে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা যেমন ছিল। অবাঞ্ছিতভাবে যা এর সঙ্গে জুড়ে বসেছে তা হলো বোম-পোটেনশিয়ালের (বোমরা যাকে বলেন কোয়ান্টাম পোটেনশিয়াল) - আলোর চেয়ে দ্রুত গতি। 'কোয়ান্টাম জগতে এরকম হতে পারে' বললে কিছু বলার নেই, কিন্তু তা তো একেবারে প্রথমেই, অর্থাৎ বেড়ালের জীবন্মৃত অবস্থাতেই ধরে নেয়া হচ্ছে।

অবস্থা কিছু অন্যরকম হয় অন্য দুটি ব্যাখ্যায়। এই দুটি হলো ইতালির খিরার্ডি, রিমিনি আর ওয়েবারের 'স্বতঃস্ফূর্ত দৈশিক স্থায়িত্বসহ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা' (কোয়ান্টাম মেকানিক্স উইথ স্পন্‌টেনিয়াস লোকালাইজেসন বা সংক্ষেপে QMSL) এবং ভয়চেক জুরেকের 'পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অব্যতিচার' (এনভায়রনমেন্ট ইনডিউসড ডিকোহেরেন্স বা সংক্ষেপে EID) তত্ত্ব। প্রথমটিতে শ্রোডিংগারের সময়ের সঙ্গে বিবর্তনের ইকুয়েশনেই পরিবর্তন ঘটানো হয়। সেখানে একটি র‍্যানডম চলক ঢোকানো হয়, যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয় মতে কোনও সিস্টেমকেই আলাদা দেখা হয় না, তাপগতিবিদ্যার 'সিস্টেমের' মত তাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একযোগে দেখা হয়। আর একথা বহুদিন ধরে জানা আছে যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে উপরিপাত ধরনের অবস্থা একটি বিশেষ অবস্থায় পর্যবসিত হয় - কেমন করে তা খুব ভালভাবে এখনও জানা নেই। তবে এ সম্বন্ধে জোর গবেষণা চলছে।

অর্থাৎ সাদা কথায় এই দুটি মতের প্রথমটি বলছে যে, যে কোনও সিস্টেমের যে কোনও অবস্থাই পুরো শ্রোডিংগারের মত অনুযায়ী বিবর্তিত হবে না। সেখানে কিছু আকস্মিক ধরনের ঘটনা ঘটবে। এই আকস্মিকতার ফল হলো দৈশিক সংকোচন। স্বাভাবিকভাবে, দ্য ব্রয়লির তত্ত্ব মেনে, যে

কণা তরঙ্গের মত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল, তা হঠাৎ কোনও ক্ষুদ্র অংশে এসে ঠেকবে। আমরা তখন বলতে পারব, কণাটি এখন এইখানে রয়েছে। এর সঙ্গে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্বের বিরোধ নেই, কারণ এই সংকোচন হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। যে মুহূর্তে আমরা ভরবেগ মাপতে যাচ্ছি কণাটির, সে মুহূর্তে অন্য পরীক্ষার আওতায় এসে পড়ছে আমাদের সিস্টেম। তখন আবার দেখতে হবে যুগ্মভাবে কণাটির অবস্থানে আর ভরবেগে কতটা করে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

খিরার্ডিরা তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী কিছু অঙ্ক কষে দেখান যে একটি বা দুটি কণার ক্ষেত্রে আকস্মিকতার প্রভাব যেরকম, বড় সিস্টেমের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি। অর্থাৎ একটি বেড়ালের পক্ষে পুরো কোয়ান্টাম অবস্থা মেনে উপরিপাত অবস্থায় ঝুলে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। খুব কম সময়েই সে তার শরীরের কোনও না কোনও অংশে আকস্মিকতার প্রভাবে 'আঞ্চলিক' হয়ে পড়বে, অর্থাৎ হয় জীবিত নয় মৃত থাকবে। কণা থেকে যত বড় সিস্টেমের দিকে যাব আমরা, এই আকস্মিকতার প্রভাব তত বেশি। কণার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক হতে যদি সময় লাগে কয়েক সেকেন্ড, বেড়ালের মত জীবের পক্ষে লাগবে প্রায় $১০^{-১০}$ সেকেন্ড। DNAজাতীয় মাঝারি গোত্রের জিনিসের ক্ষেত্রে (যাদের এখন মেসোস্কোপিক বলা হচ্ছে, অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপিক ও ম্যাক্রোস্কোপিক এ দুয়ের মাঝামাঝি) সময় লাগবে প্রায় $১০^{-৫}$ সেকেন্ড।

জুরেক ও তাঁর অনুগামীদের মতে কোহেরেন্স বা উপরিপাত অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটে পারিপার্শ্বিকের জন্য। এঁরা পারিপার্শ্বিককে নানান মডেল দিয়ে বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে তাকে উষ্ণতার উৎস হিসেবে ধরলেই উপরিপাত থেকে বিচ্যুতি দেখানো যায়। সিস্টেমের বর্ণনার মধ্যে পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা ঢুকে পড়ে আর সেই জন্য সিস্টেমের বিবর্তন দেখাতে গেলে আগে পারিপার্শ্বিকের কোনও রকম বিবর্তন ধারণা করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সিস্টেমের মধ্যে পারিপার্শ্বিকের চলকের গড় হিসাব করতে হয়। পারিপার্শ্বিক যদি খুব বড় হয় আর তা যদি তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তাহলে তার মধ্যে বিভিন্ন তাপগতীয় চলকের মানের অনিশ্চয়তা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকে। আর তার ঘনত্ব ম্যাট্রিক্সের (ডেনসিটি ম্যাট্রিক্স) চেহারা হয় কোনাকুনি, বাকি সব সংখ্যার মান হয় শূন্য। এগুলি আমরা পরিসংখ্যান তাপগতিবিদ্যা থেকে জানি। ঘনত্ব ম্যাট্রিক্স কেবল কোনাকুনি হওয়া মানেই তার মধ্যে বিভিন্ন অংশ পরস্পরের প্রভাব থেকে একরকমভাবে মুক্ত, উপরিপাত বর্ণনা সেখানে খাটে না। পারিপার্শ্বিকের এই তাপীয় বর্ণনা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এলে সিস্টেমকে উপরিপাতের প্রভাব থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। জুরেকরা এই ধরনের বিভিন্ন সিস্টেম নানান ধরনের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধরে হিসেব করেছেন সিস্টেমের আয়তনের সঙ্গে উপরিপাত থেকে বিচ্যুতির সম্পর্ক কি। তাঁরা দেখিয়েছেন খুব ছোট বস্তুতে, কোয়ান্টাম কণার ক্ষেত্রে, উপরিপাতই স্বাভাবিক অবস্থা। এর বিপরীতে রয়েছে বেড়ালের মত 'বড়' বস্তু, যা খুব সহজেই উপরিপাত থেকে বিচ্যুত হতে পারে। মাঝামাঝি রয়েছে মোসোস্কোপিক বস্তুসমূহ, যেখানে উপরিপাত অবস্থার আয়তন আর সিস্টেমের আয়তন কাছাকাছি। সেখানে স্বল্প সময় পরে উপরিপাত থেকে বিচ্যুতি ঘটবে।

বোম বা কোয়ান্টাম-পোটেনশিয়ালের কথা বাদ দিলে খিরার্ডিদের এবং জুরেকদের মতবাদে আমরা বেড়ালের জীবন্মৃত অবস্থা এড়ানোর অপেক্ষাকৃত সহজ রাস্তা পাচ্ছি। বেড়াল যে এই অবস্থায় থাকতে পারে না, সে বিষয়ে আমরা বরাবরই নিশ্চিত ছিলাম, কিন্তু প্রশ্ন ছিল কেমন করে। বিশেষ করে গৌড়ীয় অর্থাৎ বর্ন বা কোপেনহাগেন ব্যাখ্যায় উপরিপাত অবস্থাই স্বাভাবিক। সেখানে ছোট-বড়, বেশি-কম সময়ের তফাৎ নেই। যার জন্য রজার পেনরোজের মত বিজ্ঞানী বলেছেন এই (অর্থাৎ বেড়াল) প্রসঙ্গে ভবিষ্যত রাস্তা দেখাবেন খিরার্ডিরা অথবা জুরেকরা।

কোয়ান্টাম কণার এই ধরনের সংশ্লিষ্ট (এন্ট্যাংগল্ড্) থাকার ধর্ম একটি নতুন টেকনোলজির জন্ম দিয়েছে। তার নাম কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি। আজকের ইন্টারনেট যখন আরপানেট হিসেবে প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গোকুলে বাড়ছিল, তখন (বা তার অনেক আগেই) নেটওয়ার্কের গুরুত্ব বুঝেছিলেন কম্পিউটার বিশারদরা। একটা সময়ে যখন কম্পিউটারও ভবিষ্যতের গর্ভে তখন যুক্তরাষ্ট্রের এক তড়িৎকলাকুশলী (ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়র) ক্লদ শ্যানন ইনফরমেশন ও নেটওয়ার্ক দিয়ে তার আদানপ্রদান নিয়ে কাজের ভিত গড়ে তোলেন। আর ১৯৮০র দশকে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কম্পিউটারবিদ অঙ্ক কষে প্রমাণ করলেন যে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদান করতে গেলে যা করা দরকার তা হলো সবটাই 'খোলা বাজারে' করা। তথ্য দেয়া নেয়া, বিশেষ করে দুই বা ততোধিক ব্যাঙ্কের মধ্যে, অথবা দুটি দেশের সামরিক গবেষণার কাজে, এমনভাবে করতে হয় যাতে দু প্রান্তের দুই আদানপ্রদানকারী ছাড়া মাঝে আর কেউ জানতে না পারে। তা না হলে যে কেউ যে কোনও ভাবে কোনও ব্যাঙ্ক, সরকারি কোষাগার, দেশের সামরিক বা পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাফেজখানা ইত্যাদিতে ঢুকে পরে জিনিসপত্র এদিক থেকে ওদিক করতে পারে। দরকার হলো মন্ত্রগুপ্তি অর্থাৎ ক্রিপ্টোগ্রাফি। আমার আর আপনার মধ্যে গোপন সংকেত ঠিক করা আছে, আমরা সেই অনুযায়ী তথ্য আদানপ্রদান করব কোডে। অন্য লোক দেখলে মনে করবে হিজিবিজি, কিন্তু যার জিনিস সে ঠিকই বুঝে নেবে।

হিসেব করে দেখা গেল এ ধরনের সংকেত বা ক্রিপ্টোগ্রাফিরও কতকগুলি নিয়ম আছে। সংকেত যত সহজ, বাইরের লোকের পক্ষে তা বোঝাও তত সহজ। নিশ্চয় এর মধ্যে প্রকৃতির আশ্রয়বাচক কোন বার্তা আমরা খুঁজতে চাইলে পেতে পারি, তবে এইমার্গীয় মেধাটি যে কুমেধা তা বলাবাহুল্য যেমন সুমেধা দিয়ে আমরা 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বুঝতে চাইছি ও একটু একটু করেই যেন তা বুঝতে পারছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের একটা বড় সুবিধা ছিল শত্রুপক্ষের কোডওলা সংবাদ ঠিকমত পড়ার জন্য তাদের পক্ষে ছিলেন অ্যালান টিউরিং প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা। এদের অনেকেই খুব প্রাথমিক ধরনের কম্পিউটারকে একাজে লাগাতেন। সুতরাং আশ্চর্য হবার কিছু নেই যখন দেখি কম্পিউটার বিজ্ঞান বলে আজ আমরা যা জানি, তা ঐ সময়ে বা তার কিছু পরে তৈরি হয়েছে এইসব বিজ্ঞানীদের হাতে (বা মস্তিষ্কে)। যাইহোক, গত শতকের শেষদিকে বোঝা গেল সবচেয়ে কঠিন যে সংকেত ভাঙা, তা হলো সেইসব কোড যা খোলা বাজারে চলে।

কিন্তু কম্পিউটার জগতের তথা ন্যানোটেকনোলজির যত অগ্রগতি হচ্ছে, অপরাধ জগতের পক্ষে তাকে কাজে লাগানো তত সহজ হয়ে যাচ্ছে। শেষে যখন দেখা গেল ইস্কুল পড়ুয়ারাও কোড ভেঙে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়ছে, তখন কোয়ান্টাম সংশ্লেষণকে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হলো। এর সুবিধা হচ্ছে এইরকম। মনে করা যাক দুটি ব্যাংকের মধ্যে তথ্য দেয়া-নেয়ার একটি লাইন রয়েছে। এটি নিরাপদ করার জন্য আমি দুই প্রান্তে দুটি কোয়ান্টাম কণা সংশ্লিষ্ট অবস্থায় তৈরি করে রেখে দিলাম। তৈরি করার কাজটা নেটওয়ার্কের মাঝামাঝি কোনও স্থানেই করা যাক আপাতত। এখন কোনওখানে যদি কেউ বাইরে থেকে এই লাইনে ঢুকে পড়ে তাহলে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ওদের সংশ্লিষ্ট (বিশুদ্ধ) অবস্থা বিশ্লিষ্ট হয়ে মিশ্রণ হবে অর্থাৎ কণাগুলির অবস্থা হয় এরকম নয় ওরকম হয়ে যাবে। যেটা কোনও পরীক্ষক সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারবেন। .. ..

মানুষ হয়ে ওঠা (২০০৭)

সন্তান মানুষ করা অর্থাৎ জীবনের প্রথম ছয় বছর খেলাধূলা মাটিমাখা গানগল্প ইত্যাদিতে মেতে থাকা তথা মানুষ হয়ে ওঠার, দীক্ষিত হবার পার্থিব এই সংলাপ নির্মাণ ও ভাবনায় অংশ নিয়েছেন ভুবনের নানা প্রান্তের ভাবুকেরা। সঙ্গে রয়েছে খেলতে খেলতে বিজ্ঞান, গণিত, মূল্যবোধ ও আঁকিবুকি কাটতে কাটতে অক্ষর পরিচয়ের পাঠ।

ব্যক্তিত্ব, সমিতি ও শান্ত বিপ্লব (২০০৮)

খুব সহজ পথে কিন্তু দৃঢ়তা বজায় রেখে চলতে চলতেই ব্যক্তি উন্নীত হতে পারে ব্যক্তিত্বে। সেই সেই ব্যক্তিত্বের সহজ বিস্তারে সমিতি হয় বিন্যস্ত। এবং মাটি ধরে গড়ে উঠতে থাকে অসংখ্য ব্যক্তিত্বময় সমিতি তথা অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়-নির্মাণের শান্ত সমবায়। ভুবন জুড়ে চলেছে এই পথ নিয়ে পরীক্ষা, ঘটছে তর্ক ও তত্ত্বের উপস্থাপন। এই গ্রন্থ বহন করছে তার পরিচয়।

নূতন যুগের ভোরে

পথিক বসু

এই মুহূর্তে একটি প্রতিবাদ ও পথ-অনুসন্ধান আমাদের সবাইকে মনে-মুখে-কাজে করতে হবে। ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখছি হত্যা হানাহানি, দেখছি অন্যের শ্রম কুক্ষি গত না করতে পারলে 'সভ্যতা' গড়া যায় না, দেখছি ইরাক নন্দীগ্রাম, দেখছি স্টালিনি তাণ্ডব হিটলারি বিভীষিকা, দেখছি চেঙ্গিস খান ইত্যাদিদের। সবের চলাটা একধাঁচেরই সারা বিশ্ব রয়েছে ভোগ করার জন্য কিন্তু একের শ্রমে তো এই গোটা দুনিয়া করায়ত্ব করা যাবে না, তাই অন্যকে দাস করে তার শ্রম দিয়ে দুনিয়া দখল করার চেষ্টা করা যাক।

এইখানে একটা খাদ আছে। অন্যকে গ্রাস করার চেষ্টা, দুনিয়াকে ভোগ করার চেষ্টা, আমি, এই ছোট ছোট 'আমি'রাও করছি না তো? আটশো বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধব্যবসায় আমি প্রত্যক্ষে যুক্ত হয়ত নই কিন্তু নিজের নিজের জীবনে কি জীবিকায়? অথবা, অপ্রত্যক্ষ কিন্তু একান্ত প্রবৃত্তিগত হিংসায়? এই ভোগী সাম্রাজ্যে আমার ভোগ অনায়াস করতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি কি কৌশলে আমি জড়িত কি নই? সবেতেই কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পাচ্ছি! তাহলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে লড়াই, একটি শুভ সমাজের জন্য যে যাত্রা তাতে নিজের বিরুদ্ধে লড়াইটি করতে করতে চলাটা কি সত্য নয়? সততা তাই বলে। একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে, নিজের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দিয়ে সাম্রাজ্যিক শোষণের বিরুদ্ধতা - এই দুই বিপ্লবের সম্মুখে এখন আমরা। আটশো বিলিয়ন ডলার যুদ্ধ-ব্যবসা এবং ততোধিক বিলিয়ন ডলার কসমেটিক-ইন্ডাস্ট্রির কোন না কোন অংশে আমি বাঁধা - দিন থেকে রাত। চব্বিশ ঘণ্টায় এক মুহূর্তও কি অসৎ চিন্তা করি না আমরা? একটা না একটা 'অপ্রয়োজনীয়' (কিভাবে বুঝব তা?) 'বিলাসি' (কিভাবে বুঝব?) দ্রব্য ব্যবহার করছি না কি আমরা? তাহলে একই সঙ্গে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে হয়। কতটা না হলেই নয় - বিচার করতে করতে পরীক্ষা করতে করতে চলতে হয়। এবং, ঘুরে যে সেটাই যুদ্ধ কি ভোগ-ব্যবসায় আঘাত দেবে তা আজ নিশ্চিত। সেই আঘাত য়ুরোপীয় ও মার্কিন মানুষ দিচ্ছেন বলে, বাজারব্যবসা ওখানে কমে যাচ্ছে বলে, যুদ্ধবাজেরা যুদ্ধব্যবসায় মধ্যপ্রাচ্যকে বেছে নিচ্ছে, পণ্যব্যবসাকে চিন, ভারত, এশিয়ার অন্য অন্য প্রান্তে নিয়ে আসা হচ্ছে। ইকনোমিস্ট'এর ১৭ অক্টোবর ২০০৭ সংখ্যায় পাচ্ছি এই তথ্য - ব্রিক (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চিন - ইংরেজির আদ্যক্ষর মিলিয়ে হয় ব্রিক) রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত ভোগ্যমাত্রা আমেরিকার তুলনায় দুগুণ বেড়ে গেছে, এতই খদ্দের এখন এখানে। কাজেই দু চাকা, চার চাকা গাড়ি থেকে শুরু করে 'সেঝ' যে এসবেরই পরিণাম তা বুঝতে বোধহয় ভুল হবে না কারও।

প্রশ্ন উঠুক, এই সাম্রাজ্যিক সভ্যতার গলদটা কোথায় তাই নিয়ে। গলদের একটি বড় কারণ মার্কিন ধাঁচের উন্নয়নটাই যে উন্নয়ন এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণাটি। যে দেশে একর-পিছু ছয়জন বাসিন্দে উন্নয়নের সুবাদে (অর্থাৎ বিশ্ব-জুড়ে হানাহানির সুবাদে) আজ একর-পিছু দু'জন হতে পেরেছে, তাদের মর্জিমত উন্নয়ন করতে হলে পৃথিবীর এই প্রান্তের কোটি মানুষকে না-দাম না করা পর্যন্ত উন্নয়ন হবে কিভাবে? তাই ঐ ধাঁচের উন্নয়ন এখানে - এই, 'যদি হই সুজন তো তেঁতুলপাতায় নজন'এর ভুঁয়ে লোক না মেরে তো করা যাবে না(এবং তার চেয়ে বড় কথা ঐ মহাবাক্যটি - যদি হই সুজন তো তেঁতুলপাতায় ন'জন - এই কনসেপ্টটি উধাও করে দিতে হবে, স্রেফ ভুলিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় গলদ এইখানে। এই জ্ঞানভাণ্ডারটা লোপ পেয়ে যাবে বা বেঁচে থাকার প্রক্রিয়াটা এমন করে রাখা হবে যাতে তা লোপ পেয়ে যায়। যে অনাহারের ছবিটা আমরা আমলাশোলে দেখি তার মূল ঐখানেই, সেখানে মাটি ঘন সবুজ, মাটি সেই সেই খাবার দিতও যাতে আহার্য আছে, আছে স্বস্থতা(কিন্তু সে সব (যেমন কোদো, তার পুষ্টিগুণ চাল গমের থেকে কম নয়, কিন্তু সেটি এখন লুপ্ত) খাবারগুলো তৈরি করতে স্রেফ ভুলে গেছে মানুষ। তারা এখন নির্ভর চাল ডাল গমে, যা টাকা না থাকলে বাজার থেকে কেনাও যাবে না, টাকা যার নেই তাকে তাহলে যে অনাহারই মেনে নিতে হবে, রাষ্ট্রের বদান্যতার ওপর নির্ভর করতে হবে। দুঃখজনক এই পরিস্থিতি। শিক্ষা, শিক্ষিত হওয়া, মানে ঐ ঐ ট্রাডিশনাল জ্ঞান হারিয়ে বসা - নয় কি?

বিশেষজ্ঞদের অনুমান, মার্কিন মানুষদের মত ভোগ যদি বাংলাদেশের মানুষ করতে চায় তাহলে আরও দুটো পৃথিবী দরকার। অঙ্ক কষেছিলেন ফ্রিটজফ কাপরা - গড়-আউন্স খাদ্যদ্রব্য দেড় হাজার মাইল ঘুরে মার্কিন মানুষের পাতে পড়ে (আনুষঙ্গিক জ্বালানী খরচ ও পরিবেশজ বিঘ্নটি অনুমেয়) এবং গড়খাবারের অন্তত ষাট ভাগ স্রেফ ফেলে দেয়া হয় মার্কিন খাদ্যরীতিতে। সম্প্রতি 'টাইম' পত্রিকা একটি সারভাইভাল গাইড প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখছি এমনই চিত্র। বি.এম.ডব্লিউ নয়, বার্গার-কালচার ভুবনের আঠারো শতাংশ গ্রিন-হাউস-গ্যাস নির্গত করছে যা এমনকি যাতায়াত-ব্যবস্থায় ব্যয়িত জ্বালানির থেকেও বেশি। কিভাবে তা ঘটছে? ভারি অদ্ভুত এই চক্র। গবাদি পশুর হাই-মল-মূত্র থেকে বার হচ্ছে মিথেন আর নাইট্রাস অক্সাইড। মিথেন কার্বন-ডায়-অক্সাইডের থেকে তেইশ গুণ বেশি 'গরম' আর নাইট্রাস অক্সাইড দুশো-ছিয়ানব্বই গুণ বেশি 'গরম' করে দেয় বাতাবরণ। এই গবাদি পশুগুলোর সর্ববৃহৎ অংশটি বার্গার-সংস্কৃতির জন্য বলিপ্রদত্ত। তাদের পালাপোষার জন্য সাবেকি কৃষি বিপর্যস্ত, অনাহার ভবিতব্য। সিদ্ধান্তে 'টাইম'এর মন্তব্যটিও মজার - নিরামিষে ফেরো!

আমাদের প্রান্তে কিন্তু রাজনীতিবিদদের 'গলা-কাটা-মুরগি'র দশা। উন্নয়ন মানে মোটর গাড়ি, ম্যাকডোনাল্ডস্, ওয়ালমার্ট ইত্যাদিদের রিটেল-স্টোর। হারভার্ডের অর্থশাস্ত্রী এবং অ্যাক্টিভিস্ট বিল ম্যাকিবেন দেখেছেন ঐ পনেরোশো মাইল ঘুরে আসা ওয়ালমার্ট-জাতীয় রিটেল-স্টোর থেকে কেনা ফসলটি যদি স্থানীয়ভাবে তৈরি হতো তাহলে একদিকে যেমন দশ-গুণ শক্তি বাঁচানো যেত, অন্যদিকে আরেকটি জিনিস সঞ্চয় হতে পারত, যাতে আমেরিকা, পিছিয়ে-পড়া-দেশগুলোর মধ্যে, অন্যতম। তা হচ্ছে - সমিতিবোধ। প্রত্যক্ষ পথে চাষির কাছ থেকে কেনায় যোগ হচ্ছে, কৃষকের সঙ্গে ক্রেতার সংযোগ। ম্যাকিবেন এই সত্যটি পায়ে হেঁটে (তাঁর কথায় - গান্ধির মতোই) পরখ করেছেন, দেখেছেন ঋতুজ ফসল যেমন স্বাদু টাটকা স্বাস্থ্যকর তেমনই পাওয়া যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ ও প্রাকৃতিক সুন্দরতা। অভ্যন্তরীণ শক্তির অপচয় তো অঙ্ক কষেই বার করা হয়েছে। এই শিক্ষাটি নিয়ে ম্যাকিবেন যখন চিনে যান গবেষণার কাজে, যখন শোনেন ২০৩১-এর মধ্যে ১.৩ বিলিয়ন মানুষ গাড়ি খরিদ করার মত ক্ষমতা পেয়ে যাবে - এমনই সেখানকার অগ্রগতি - আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাঁচার অন্য ও অনন্য বার্তা প্রচারের জন্য এখন তিনি গান্ধির চলাতেই আপাতত মগ্ন। তাঁর অভিমত - আমেরিকাকেই মোড় নিতে হবে, নাহলে বিশ্ব সম্পূর্ণ ভুল ভাবে মার্কিন-মডেল ধরে এগিয়ে ভুবনকে বিপদে ফেলে দেবে।

তাই তো হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষার চিত্রটি কি তাই নয়? তেতুঁল পাতায় ন'জন আমরা একদা ছিলাম, তার কুশলতা ও স্থৈর্য আজ অভ্যাসে নেই আমাদের। ওদিকে, জাঙ্ক-ফুড কালচারে রাষ্ট্রের ওপরতলাটি এগিয়ে এসেছে, সেই চাকচিক্য আপামর জনতাকে অপচয়ের পথটিই অ্যারিস্ট্রোক্রাটিক পথ, জাতে ওঠার পথ, বলে, প্রলোভিত করছে।

এই সাম্রাজ্যিক উন্নতির এই চিত্র আমরা সবাই দেখছি। বিত্তবান আর বিত্তহীনের আসমান-জমিন ফারাক। আগে ইংরাজিতে ব্যবহৃত হতো - হ্যাভ আর হ্যাভ নট। এখন ব্যবহৃত হচ্ছে, হ্যাভ-লট আর হ্যাভ-নট। শতকরা পনেরো জন ওপরতলায়, পঞ্চাশ জন নিচতলায়, মাঝের পঁয়ত্রিশ এপাশ সেপাশ। পঞ্চাশের জন্য অফুরন্ত নেশাপানি, জাতিবর্ণধর্মদাঙ্গায় জড়িয়ে রাখা। আমেরিকায় ওর ওপরও একটা ইন্ডাস্ট্রি চলে। জেলখানা তার নাম।

এই সবকটিকে নিয়ে ভাবলে দেখি, পুঁজি ও প্রযুক্তি মানবমনের তমো-দিকটির ওপর নজর রেখে এগিয়ে চলেছে। সমাজবিজ্ঞানে এই শব্দটি সম্ভবত নতুন, কিন্তু একে আনার সময় এসে গেছে।

২

ভারতীয় দর্শনের একটি ধারায় ভাবা হয়, চিন্তা বা সংকল্প বা বাসনা মরে না(যা মরে তা হলো দেহ। সেই হিসেবে, বাসনা মেটাতে, বারবার দেহ-ধারণ করতে হয়। তাই, কোনও এক সময়, মানুষ যখন জন্মজনিত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির কথা ভাবে(তখন সে দেখে, তার বাসনাই যাবতীয় দুঃখের কারণ। তখন যদি সে সংকল্প করে কামনা-বাসনা শূন্য হবার, সে সংকল্প রাখতে হয় চেষ্টিত, তাহলে, ধরা যেতে পারে, নিষ্কাম জীবনযাপনের ফলে সে আর শরীর ধারণ করবে না।

প্রশ্ন ওঠে বারবার জন্ম নেবার শরীর ধারণ করবার ধারণাটি যৌক্তিক কি না তাই নিয়ে। গৌতম-বুদ্ধ তার সহজ মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। লোকায়তিক দার্শনিকেরা সহজ আচার পরখ করেছিলেন। বুদ্ধের ভাবনা ছিল এইরকম। জীবন দুঃখময়। দুঃখের কারণ আছে। তা হলো, কামনা। কামনা চরিতার্থ হলে আরো কিছু পাবার সাধ জাগে, তা মিটলে আরও। এভাবে চললে বিশ্বসংসারের সবকিছুকে নিজের বলে আঁকড়ে রাখতে সাধ হয় - যা পাওয়া যায় না। কাল (time) তেমনই শরীরে কামড় বসায়। শরীর অশক্ত হবেই, ভোগ তাই মেটাতে পারে না মানুষ। এই অতৃপ্তিটা, একসময় না একসময় মানুষকে তাই না-পাবার দুঃখটা পেতেই হচ্ছে। বুদ্ধ বললেন, এইটেই যেহেতু দুঃখের কারণ, তাহলে তুমি, এই জীবনেই মনোজয়ী বাসনাজয়ী হবার পথ যদি ধরতে পার (ধম্মপদে বলা হলো - অন্তিমে একমুঠো ছাই) তাহলে কামনাশূন্য হয়ে তুমি দুঃখহীন কাল কাটাতে পার। আর লোকায়তিকরা,

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাউল-সম্প্রদায়, তাদের বিদ্রোহী চরিত্রটি যাতে অন্য কারোর (অর্থাৎ তাদের সন্তান-সন্ততিদের) দুঃখের কারণ না হয়ে যায়, সেজন্য, লা-শরিক (অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন নয় অথচ যৌন-সংসর্গ করা) হবার কৌশল উদ্ভাবন করেছিল।

আমরা এখান থেকেই শুরু করব। আমার একটা স্থূল চাহিদা আছে। যার কিছুটা 'জিন' থেকে 'হয়ত' আমি পেয়েছি(বাকিটা কিন্তু পরিবেশ থেকে পাচ্ছি, যে পরিবেশে আমি বড় হচ্ছি শিক্ষি ত হচ্ছি। চাহিদাগুলো যেমন প্রাণীর ক্ষে ত্রে তেমনই আমারও অর্থাৎ মানুষের ক্ষে ত্রে। আহার নিদ্রা মৈথুন। এগুলো তো রইলই, মানুষের ক্ষে ত্রে আরেকটু বেশি যোগ হলো যা অন্য প্রাণীদের ছিল না। মান, সঞ্চয় ইত্যাদি। এগুলো আমি ধরে রাখতে চাইব। পরিপার্শ্ব আমাকে তাই শেখাচ্ছে। লেখাপড়ায় যত এগোচ্ছি এইটেও শিখে নিচ্ছি। চাকরি তাই শেখাচ্ছে। এমনকি বেকারত্বও মানহীনতার জ্বালা দিয়ে ঐটেই শেখাতে চাইছে। এইসব চাহিদার আবার একটি দিক রয়েছে যা আমি পেতে পারি অন্য-শ্রম-ভোগ বাবদ। অন্যে খেটে আমার তহবিল ভরাট করবে - এই বাবদ। কেন অন্যে খাটবে? কারণ আমার ক্ষমতা, আমার প্রতিপত্তি কিংবা আমার দাপট। প্রাণীর বেলা তা ছিল একটু অন্যরকম। বাঘ হরিণকে খায় তার থেকে বলবান বলে - কিন্তু, মানুষের বেলা সেইটে অন্যরকম। মানুষ কুক্ষি গত করতে, সঞ্চয় করতে ভালবাসে। সেই লালসা থেকে সে অন্য-শ্রমকে করায়ত্ব করার কৌশল ফাঁদে। তার জিত তথাকথিত মানব-সাম্রাজ্যের অগ্রসরতা। রাজা রাজত্ব দাস দাসত্ব - এই নিয়ে সেই চলা।

এই যে অন্য-শ্রম-কুক্ষি গত করার মন এটাকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে তামসিকতা বলে। জন্ম জন্মান্তর এইসব প্রশ্ন তুলে এখানে লাভ নেই, তার প্রয়োজনই নেই। তেমনই, 'শ্রেণী' - এই প্রশ্নটা তুলেও কোনও লাভ নেই। আমি 'কালো' হয়েও কন্ডোলিৎসা রাইস কি কলিন পাওয়েল হতে পারি, 'দলিত' হয়েও মায়াবতী হতে পারি। তাতে করে ঐ 'কালো' কি 'দলিত' শ্রেণীরা মনুষ্যত্বের মর্যাদা পায় না। পরে, 'শ্রেণী' প্রশ্নটা উঠবে আবার, মহড়াটা এখান থেকে শুরু করে দিলাম। মানসিকতার প্রশ্নটা এখান থেকে বুঝে নিতে চাইছি। আর, এই মানসিকতাটি আমার আছে কি না তা বিবেচনা করলে দেখছি, 'আমি' কোন একটা সময় অন্যের শ্রম আত্মসাৎ করে আমার ভাণ্ডার ভরাট করতে চাই। এইটিই তামসিকতা। আবার সমাজ তো সর্বদা সর্বত্র এভাবে চলে না। সাম্রাজ্য ও সমাজ - শব্দ দুটোর মধ্যেই সেই ফারাকটা রয়েছে। সামঞ্জস্য ব্যাপারটি মানুষ আরেক মন নিয়ে সচেতনভাবে সৃষ্টি করেছে। সেটিই সমাজ গড়েছে। সুনীতি দেশাচার সদাচার - এসবের একটা শিক্ষা আছে, ঐতিহ্য আছে, ধারা আছে। মানুষ স্বীয় জীবন দিয়ে দেখেছে, সার্বত্রিক শান্তি সমৃদ্ধি ছাড়া নিজেকেও রক্ষা করা কঠিন। রাজসিকতার বলে সে তাই সদাচার স্থাপন করেছে। তা ভেঙেছে আবার গড়েছেও ('মহাভারত' তারই নিদর্শন)।

একটা সংসার গড়ার মূলে অনেকটাই জুড়ে রয়েছে নিঃস্বার্থ ভালবাসার বন্ধন। তারপর হয়ত ঐ বাঁধনই সদাচারের অভাবে, চেতনাহীন অভ্যাসের ফলে বেড়া হয়ে যায়। এইসব সুনীতিশিক্ষা ও সদাচার মানুষই সৃষ্টি করেছে, লালন করেছে, আবার মানুষই তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কখনো পেরেছে কখনো পারেনি। আমরা দেখেছি, মানুষের মধ্যে, তমো-মনোবৃত্তি সত্ত্বেও, এই আকাঙ্ক্ষাও বড় প্রবল যে, তাকে মুক্তিও পেতে হবে। সে ভাবে, সে খুঁজতে চায় তার বন্ধন দশাটি নিয়ে। তখন তার চোখে ধরা পড়ে, তার অন্য-শ্রম-দখল-বাসনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তাকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথে যেতে দিচ্ছে না। প্রবল বিক্রমে সে এই মনোবৃত্তিটির বিরুদ্ধে লড়তে চায়। এই লড়াইটি এক বীরের পক্ষেই করা সম্ভব। এই মানসিকতাকে বলে রাজসিকতা।

এরপর, সবশেষে, আরেক যাত্রা। মনোজয়। মনের গুহ্যতম প্রকোষ্ঠে জমে থাকা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়ে আত্মজয়ী হবার পর সে অনুভব করে 'নদীর জল আর এঁদো জল'এ কোনো ফারাক নেই। সত্য শুভ সুন্দর সর্বত্র সমান বিধৃত। তখন তার মধ্যে জাগে আরেক মন। তার ও অন্যের ভেদ-অভেদ পর্যায়ক্রমিক সাজানো। এই মননকে সাত্ত্বিক মনন বলা হয়। তখন সে বীতরাগ বীতশোক প্রভৃতি। যেটি মানুষ, চাইলে, তার এক জন্মে পেতে পারে কি না বলা যায় না, কিন্তু চেষ্টা যে করতে পারে, তা বলা যায়।

এই সত্ত্ব-রজ-তম মনোবৃত্তিটি মানুষের মনে সর্বদা কাজ করে চলেছে। সাম্রাজ্য বিস্তারটিও সচেতন এই তামসিকতার প্রতি। রাষ্ট্র তাই 'মান' 'সঞ্চয়' 'বৃত্তি' 'স্ট্যাটাস' বজায় রাখবার একটা 'ইচ্ছা' সাজিয়ে রেখেছে। মানুষ যখনই সাম্রাজ্যিক শিক্ষা বা বৃত্তির দিকে যায় - সে পড়ালেখা হোক কি কলেমিলে কাজ করা হোক - তার সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্ট্যাটাস-উচ্চাসন। এটি তাকে আরেকটু 'উঁচু' স্তরে 'ওঠবার' জন্যে প্রলুব্ধ করে। আমরা বলি, ভোগবাদী মানসিকতার শুরু হয় এইভাবে। একবার এটি মানুষকে পেঁচিয়ে ধরলে তা পার হবার যে লড়াই, তা একই সঙ্গে তাই 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এবং আত্মজয়ী হবার যুদ্ধ। আমি যত সহজ পথে প্রবিষ্ট হবো - তত অন্যের, এমনকি প্রকৃতিরও, মুক্তি। দুজন মানুষ ম্যাকডোনাল্ডকে বর্জন করতে চাইল বলে ম্যাকডোনাল্ড-বার্গার-বিলাসকে আজ য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে পাততাড়ি গুটোতে হয়েছে। সেই ইতিকথাটি এখন শোনা যাক।

নব্বইয়ের দিকে দুজন ব্রিটিশ সত্যাগ্রহী একটি ম্যাকডোনাল্ড-স্টোরের বাইরে প্ল্যাকার্ড ঝোলায়। স্টোরের কর্মীদের কম মাইনে, তাদের তৈরি খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার, সেই খাদ্য প্রস্তুতির সঙ্গে (গরুমোষ চাষের জন্য জমির প্রয়োজনে) অরণ্য-নিধনে মদত দেয়া, বার্গার-পশুদের পালাপোষা এবং জাঙ্ক-খাদ্যের নিম্নমান - এইসবগুলোকে জুড়ে তারা লিফলেট প্রচার করতে থাকে। ম্যাকডোনাল্ডও ছেড়ে কথা বলে না। আইনের আশ্রয় নেয়। যুবকদুটিও বেপরোয়া। র‍্যাচেল কারসেন যে সময়ে মনস্যান্টোর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তখন তাঁকে পাগল প্রচার করায় সুবিধে ছিল, কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। যুবক দুজন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক ধরে যেমন আত্মপক্ষে যুক্তি বিছোয় তেমনই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরেক বিপ্লবের সূচনা করে। জন্ম নেয় ম্যাকস্পটলাইট (macspotlight) ওয়েবসাইট। আইনি লড়াই চলতে থাকে। ওদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ম্যাকস্পটলাইট আসাযাওয়া করতে করতে পরিস্থিতি এমনই হয়ে যায় যে, গোটা য়ুরোপ ও আমেরিকা জুড়ে ম্যাকডোনাল্ড সম্বন্ধে মানুষের বিরূপ মনোভাব এসে যায়। গার্ডিয়ান (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬) জানিয়েছিল, ঐ পাঁচ বছরে বারো মিলিয়ন অ্যাকসেস ঘটেছিল ঐ ওয়েবসাইটে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অন্যরকম রূপ পেতে থাকল।

সেই ম্যাকডোনাল্ড ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে এখন এখানে। এবং সে যথারীতি স্ট্যাটাস-বোধে ঘা দিচ্ছে। আমি ম্যাক'শপে যেতে পারলে সাম্রাজ্যিক বিচারে জাতে উঠব। তাই আমাদের, চিন-ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের, যা জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম পনেরো শতাংশ এবং কোটি সংখ্যার বিচারে বিরাট সংখ্যা - তাদের বুঝে নিতে হবে কি করা উচিত। 'টাইম' গ্লোবাল-ওয়ার্মিং'এর দাওয়াই হিসেব বলছে নিরামিশাষী হও, গান্ধি আরও অনেক গভীর দিয়ে সে পথের পরীক্ষা করেছিলেন ও সত্যতা বুঝিয়েছিলেন। রোধ করার পথটি আশা করি দুজন অ্যাফ্লুয়েন্ট পাশ্চাত্য-যুবক রজোগুণ প্রদর্শন করে

দেখিয়ে দিয়েছে।

৩

পুনরায় তমোদিকটিতে বিশ্লেষণের আলো ফেলে দেখছি, মানুষ নামের প্রাণীটির মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা রয়েছে যা আর কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। এটি একেবারেই মানুষের নিজস্ব সম্পদ। তো, এই ছাড়িয়ে যাওয়াটিকে সে শুভ ও অশুভ দুভাবেই রক্ষা করে, প্রাণিত করে। সে ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছায় এমন কুশলতা অর্জন করল যা উদাহরণস্বরূপ রূপ নিতে চলেছে পিরামিডে, যাকে রূপ দিতে আবার প্রয়োজন দাসদের! আমি বিজ্ঞান চর্চা করছি, তাই আমাকে আরামে রাখা দরকার, তার জন্য দরকার ভৃত্যবাহিনীর! সূত্রটা ঐ - আমি আমার থেকে বড়, আর সেই বড় হতে গিয়ে আমি জ্ঞানত অজ্ঞানত অন্যকে - অন্য মানুষ এবং না-মানুষ-প্রাণীদেরকে ছোট করে ফেলছি। একই সূত্রে। জেনে, না জেনে। জানাটায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত দেখি, না-জানাতে নিজে থাকি এবং নিজেকে দেখতে পাই না বলে না-জানায় থাকি।

ভারতীয় বিদ্বৎজনেরা ছাড়িয়ে যাওয়ার এই পুরো পর্বটি দেখে মানসিকতায় তিনটে প্যাটার্ন কল্পনা করে নেন। তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক। যে স্তরে মানুষ অন্য-শ্রম কুক্ষি গত করে 'বড়' হতে চায় সেটি তামসিক। যখন স্বশ্রম দিয়ে সে দশা ছাড়িয়ে যাবার গতি আসে সেটি হলো রাজসিক। আর যে স্তরে পৌঁছে এই চাওয়াগুলো কোন মূল্য বহন করে না, যা গুরু গোবিন্দ'এ রবীন্দ্রনাথ বলেন - 'ওই শোনো শোনো কল্লোলধ্বনি/ ছুটে হৃদয়ের ধারা/ স্থির থাকো তুমি, থাকে তুমি জাগি/ প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি - .. .. ওই চেয়ে দেখো দিগন্ত-পানে/ ঘনঘোর ঘটা অতি/ আসিতেছে ঝড় মরণেরে লয়ে,/ তাই বসে বসে হৃদয়-আলয়ে/ জ্বালাতেছি আলো - নিবিবে না ঝড়ে,/ দিবে আনন্দ জ্যোতি'। সুখেদুঃখে সমদূরত্ব যে মন, অথচ ক্রিয়াশীল যে মন, তাই সাত্ত্বিক।

সচরাচর, ফ্রেম-অফ-রেফারেন্স'এ হয় আমি আমার অবস্থানটি 'বড়' রাখতে গিয়ে চারপাশকে 'ছোট' করি অথবা নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে আরো আরো শানিয়ে তুলে, যা রয়েছে তার থেকে 'বড়' করি। এই দুইই ঘটে। তৃতীয়টি হলো এসবের ঊর্ধ্বে আরেকটি স্তর। যখন ইন্দ্রিয়ের শাসন তিরস্কার উসকানি ইত্যাদি থেকে আমি বিবিক্তি লাভ করি, যাকে বলে বিবেক জ্ঞান। যদি আমি যাথার্থ্য বিবেচনা করতে শিখি - যাকে 'বড়' হওয়া বলছি, যা পেলে হই সুখী আর না পেলে হই দুঃখী - এমনটা যখন মনে আসে না(কাজে থাকি কিন্তু কামনায় থাকি না(- তাকে বলে সাত্ত্বিক দশা। কার্যত তখন কামনাশূন্যতাই অভিপ্স বলে 'নিজের দিকে তাকানো', আমারই এই পরিণামি দেহ-মন থেকে উঠে অপরিণামি অবস্থানে থেকে তাকাতে পারি আমি। সেটিই প্রধান হয়ে যায়। আমি আমার থেকে বড় - এখানে বড় প্রশ্নটা তাহলে তো এই যে, আমি কে? সেই প্রশ্নে স্থির থেকে মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের চাহিদাগুলোকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিতে থাকে। এই সময়টায় মানুষের মনে একটা দ্বন্দ্ব ওঠে যেটি কঠোপনিষদ থেকে এইভাবে শুনি পরস্পর বিভিন্ন হলেও শ্রেয় ও প্রেয় দুইই মানুষের কাছে আসে(বিবেকবান পুরুষ এই দুটিকে পৃথক করতে পারেন(তারপর শ্রেয়কে বেছে নেন(আর অজ্ঞানী ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তু রক্ষার জন্য প্রেয়কে বেছে নেয়।

বাস্তবটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। 'বড়' হতে চাইছি - এই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়েই বড় হতে চাইছি বা বড় হচ্ছি। এটি একরকম চলা। এই চলাটির দিকেই ক্রমাগত 'নজর' দিয়ে চলেছে আগ্রাসী অর্থনীতিরাজনীতিসমাজনীতি। যতদিন না ঐ 'আমি'কে জয় করে 'বড়' হবার প্রক্রিয়ায় মানুষ চলতে পারছে ততদিন এই গ্রাসী চলাতে তাকে হয় নিজেকে সঁপে দিতে হবে, নয় বৌদ্ধিক মধ্যপন্থা নিয়ে শণৈঃ শণৈঃ অভীপ্স আত্মজ্ঞানে পৌঁছতে হবে। অন্য কোন পথ নেই।

অর্থাৎ ভোগ করব, দখল করব অনায়াসে - এই মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একরকম চলা যায়। এর ওপর বিজ্ঞান চলে, বাণিজ্য চলে, চলে যুদ্ধ। এবং যা সার্ত বলেন তাও ঠিক, লোকক্ষয় একটা থ্রেশোল্ড পার হলে, যখন বাজারটি টলোমলো হয়ে ওঠে, তখন এই যুদ্ধকর্তারাই ঢাকঢোল পিটিয়ে শান্তি স্থাপন করে। এই চলাটাই আজকের সরবতম চলা। স্বীকার করতে তা বাধা নেই। এর শোরগোলে আমরা অনেকে এই চলাটিই যেন একমাত্র সেরকম বুঝে থাকি। যদিও ঠিক এর বিপরীত একটি চলা নিঃশব্দে পৃথিবী জুড়ে কাজ করে চলেছে। সেটি এতই নিবিড় ও শব্দহীন যে আমরা তাকে শনাক্ত করতে ভুলে যাই। অথচ এটাই হলো মুখ্য চলা। মানুষ যে বেঁচে রয়েছে তা যে এই চলাটিরই রণন সেটি ভুলে বসি। সে চলা হলো ভালবাসার চলা, কল্যাণের চলা, অহিংসার চলা। মা যখন সন্তানকে আপনার অন্নরস দান করেন, যে দানে এই মানব সভ্যতা সংস্কৃতি কৃষ্টি জেগে থাকে তাকে আমরা খুব কাছের বলে চিনতে পারি না সহজে, কিন্তু চিনলে আর সব চেনা ম্লান হয়ে যায়। সেখানে আমি নিঃস্বার্থে ও নিঃসংকোচে অন্যজনকে আমার অংশবিশেষ দিয়ে খুশি হই। হিসেবটা উল্টোদিক দিয়ে যদি করি আটশো বিলিয়ন ডলার যুদ্ধব্যবসায় এতদিনে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত কিন্তু যাচ্ছে না তো। ইরাক দখলে আমেরিকা হেরে গিয়েছে ধরে নেয়া হচ্ছে (জোনাথন পাওয়ার এই শব্দটাই ব্যবহার করেছেন) - প্রায়-প্রতিরোধহীন যুদ্ধ, একতরফা স্যাটেলাইট-নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ - তবু পরাজয়? অর্থাৎ, এত বিত্ত এত অর্থ এত দম্ভ সব ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন তো উঠবেই - চেঙ্গিস খান বিলুপ্ত, বিলুপ্ত হিটলার স্টালিন - তাহলে কে এখনও শুদ্ধ সমাজ নির্মাণ করে চলেছে, স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছে অগণিত মানুষকে? এই শক্তিটিকে তাই চেনা জানা ও লালন করা দরকার। কঠোরভাবেই কল্যাণে থাকা দরকার, ঐ কল্যাণের সদর্থেই ভালবাসা দরকার। সেটিও 'বড়' হওয়া, সেটিও ছাড়িয়ে যাওয়া।

৪

ছাড়িয়ে যাবার জন্য মানুষের সামনে চারটে দিক। চারভাবে সে পুষ্ট, ঋণী, কৃতজ্ঞ। চারদিকে তার ঋণ শোধ করবার সম্ভাবনা। প্রথমটি হলো সে আর তার মহাবিশ্ব। দ্বিতীয়, সে আর তার চারপাশের প্রাণময় প্রকৃতি যাতে আকাশ বাতাস জল মাটি রোদ আলোর সঙ্গে কোটি না-মানুষী প্রাণের সম্মিলন। তৃতীয়, সে আর তার পরিবার পড়শি, সমাজের প্রত্যক্ষ তম মানুষের ক্ষেত্র। চতুর্থ, সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, সে আর তার আত্ম, তার ভাণ্ড, যার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড আবৃত রয়েছে বলে ভাবুকেরা অনুভব করেন। একটি মানুষ মানে এই চারে ব্যাপ্তি। অর্থাৎ মানুষের উন্নয়ন মানে এই চারের একযোগে উন্নয়ন। অর্থাৎ সেটা কোন উন্নয়নই নয় যাতে এই চারের কোন একটি বা দুটিতে বা তিনটিতে ঘাটতি থাকে। তাহলে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম কোন

উন্নয়নের পরিকল্পনাই নয়, যেমন নয় ইরাক-আফগানিস্তান দখল। যে উন্নয়নে মানবতাকে হত্যা করা হয়, মামাটিজমিনধরিত্রীকে লাঞ্ছিত করা হয় তাতে, আমি চড়বার মতো একলাখ টাকায় গাড়ি পেতে পারি (অর্থনীতির ভাষায় গাড়িকে বলা হয় পাবলিক ব্যাড - কারণ তাতে যে চড়ছে তার তৃপ্তি ছাড়া সমাজের সর্বস্তরে ক্ষতির মাত্রা বেশি!) কিন্তু পূর্বোল্লিখিত চারটে দিক উপেক্ষা করে যে চলা - কি করে বলব তাকে উন্নয়ন? আর মানবোন্নয়নের এর থেকে সঠিক সংজ্ঞা আর কিছু নেই। আর কিছু নেইই, স্রেফ নেই।

প্রতিবাদটা এইখান থেকে শুরু করব আমরা। একটা মানুষ মানে একটি মানুষই শুধুমাত্র নয়, তার ভোগদখল নয়। তার মধ্যে একটা মহাজাগতিক আমি রয়েছে, কেউ তাকে বলছেন 'বুল্লা কি জানা হ্যায় কৌন', কেউ বলছেন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' - উন্নয়ন ঐ মানুষকে বাদ দিয়ে কি করে হবে? একটি মানুষ মানে তার পরিবার পড়শি সমাজ মিলেমিশে একাধিক মানুষের সমিতি - কারোকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে, কারোকে বেশি পাইয়ে দিয়ে কি করে উন্নয়ন হবে? একটা মানুষ মানে তার চারপাশের বিপুল প্রাণের মেলা, না-মানুষী প্রাণের পারস্পরিক বোঝাপড়া, গাছ পাখি প্রজাপতি থেকে শুরু করে আকাশ বাতাস মাটি জল রৌদ্র - সবের অর্কেস্ট্রা। তো, কেউ কি কখনো বলেননি 'আকাশ আমার ভরল আলোয় আকাশ আমি ভরব গানে'? সেগুলো নাশ করে কি করে হবে মানব-উন্নয়ন? একটা মানুষ মানে এই মহাবিশ্ব - এই মহাবিশ্বকে আঘাত করে উন্নয়ন?

প্রতিবাদটা এখান থেকে শুরু হবে। এই যুক্তি দিয়ে শুরু হবে। যেখানে এই চারে পড়েছে আঘাত সেখানে আমাদের তীব্র অসহযোগ অথচ শান্ত দৃঢ় কল্যাণমনস্কতা থাকবে। কেউ যদি সঙ্গী না হন তো একাই নির্মাণে নেমে পড়তে হবে। এক এক করে নিত্য-ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যগুলোকে বর্জন করতে হবে - শুরুটা এভাবেই হবে। পাশাপাশি ঘটে চলা নরহত্যাগুলি স্মরণ করেই শুভবুদ্ধি আসুক এমন প্রার্থনা করে উন্নয়নে সঞ্চারিত নরহত্যার বিরোধিতা করে আমি ঐ ঐ ঘাতক-পরিকল্পনার বিরোধিতা করছি তা বলব, পাল্টা পরিকল্পনা পেশ করব। অন্তত মার্কসবাদী বুদ্ধিমানদের অজিত নারায়ণ বসুর 'গ্রামবাসী দিয়ে গ্রাম পরিকল্পনা' ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

নতুন যুগের ভোরে এই আমাদের যাত্রাপথ। এও এক বিপ্লব। যা হিংস্র কখনও নয়। তা শান্ত কিন্তু নির্ভীক। ও নিরলস তার চলা। যার প্রেরণা এই মহাবিশ্ব থেকেই পাচ্ছি, বহুদিন আগে থেকেই আমাদের 'বিপ্লবী' সুফিসন্তআউলবাউলেরা চিনে নিয়েছিলেন তা, গান বেঁধেছিলেন - তবু দেখরে দেখ আমার কেমন গুরু সাঁই, ফুল ফোটাচ্ছেন বাস ছোটাচ্ছেন তাড়াহুড়া নাই -।

আত্মজয়ের এই যে অভিযান তার সঙ্গে সংঘশক্তি যুক্ত হবে। হওয়া দরকার। না হওয়া অবধি তিনি একাই কাজ করে যাবেন। সেই কাজই অন্য মানুষদের ডেকে আনবে। সংঘশক্তি জাগবে এভাবে। একজন একদিক ধরে এগোবেন, দশজন মানুষ দশদিক ধরে এগোবেন। যোগফলে এক একজন মানুষ দশদিগন্তেরই স্বাদ পাচ্ছেন, যা তিনি একা কখনই পেতে পারতেন না। তাই তমোনাশি উদ্যোগ নিতে নিতে সংঘ-বিস্তারের ভাবনায় আসতে হয়, কিন্তু সতর্ক থাকতে হয় সংঘ যাতে সাংঘাতিক না হয়ে ওঠে তাতেও। সে সংঘ পিরামিড না হয়ে যেন অনুভূমিক ভাবে এগোয় অর্থাৎ ছোট ছোট ইউনিটের কথা ভাবতে হয়। ভার্টিক্যালি না বেড়ে হরাইজন্টালি বাড়বার কথা ভাবতে হয়। এই মাটি-ঘেঁষে চলা সমিতিগুলি সমাজকে রাষ্ট্রকে বিশ্বকে 'প্রজাপতি-প্রক্রিয়া'য় প্রভাবিত করবে। এই অভিযানভূমিটিকে বুঝতে এবার আমাদের একবিংশের দুটো ডমিন্যান্ট বিপ্লব নিয়ে ভাবতে হবে। এই দুটি থাকতে কেন তৃতীয় ঐ শান্ত অভিযানের কথা ভাবা হচ্ছে তা বোঝার জন্য তথ্য-বিপ্লব ও মার্কসীয় বিপ্লব নিয়ে কিছু ভাবনা প্রয়োজন।

৫

আমরা জেনেছিলাম সামন্ততন্ত্র-যুগের চাষের জমি থেকে লোক তুলে এনে কারখানায় বসিয়ে একটি নতুন তন্ত্র শুরু করা হয়েছিল যা যন্ত্রযুগ নামে খ্যাত যার পরিণাম পুঁজিতন্ত্র, যার অনিবার্য গতি সাম্রাজ্যবিস্তারে। ফলে যাদের লক্ষ্য বিস্তারই তাদের নিজেদের মধ্যে অধিকারী শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করতে গেলে সংঘর্ষই একমাত্র পরিণতি। মার্কস-কৃত এই ব্যাখ্যায় সামান্যতম সংশয় কারো ছিল না দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের রকম দেখে। এই যে কারোরই ছিল না সংশয় এটিই ভাবাতে শুরু করল সুস্থতা তাহলে কোন পথে তা নিয়ে। এখানে দুটি পরিচ্ছন্ন পৃথকধর্মী ভাবুক সম্প্রদায় দেখি। তৃতীয় ধারাটি কিন্তু নিঃশব্দে দৃঢ়ভাবে চলেছিল, গান্ধি-রবীন্দ্রনাথ তা নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা করে চলেছিলেন। বিশ্ব যে বেঁচে রয়েছে তা এই নির্মাণেই কিন্তু যেহেতু তাতে ঢক্কানিনাদ নেই তাই তার থাকাটা নজরে আসছিল না। সেই ধারাটির কথাই আমাদের মুখ্য, কিন্তু তার আগে প্রথম দুটি ধারার ভাবনা কি ছিল তা বুঝে নেবার দরকার আছে।

একদল ভাবুক ভাবলেন - ১. এই শিল্প এই প্রযুক্তি এই বিজ্ঞান যেহেতু বাস্তব-সত্য তাই একে ভেঙে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' ভাবা রীতিমত মূর্খতা, তাই একে মালিকের নিজেদের মধ্যে অবধারিত সংগ্রাম ও বিনাশের যুক্তিসত্য ধরে শ্রমিকের নেতৃত্বে ঘুরিয়ে আনতে পারা যায়। কারণ যন্ত্রটা চালাচ্ছে শ্রমিকই, মালিক নয়, কাজেই তারা মালিক ছাড়াই যন্ত্র চালিয়ে দিতে পারবে, পারবে শ্রমিকরাজ গড়তে যেখানে মালিকের ভোগবিলাসের বদলে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার পাওয়াটাই হবে লক্ষ্য। বলশেভিক বিপ্লব এবং তৎপরবর্তী ইউ এস এস আর দেখাল সেটা পারা যাচ্ছেও। সেই আশায় বুক বেঁধে কিভাবে শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব পাবে ও দিকবিদিকে তাদের জয়যাত্রা ঘটবে সেটি হয়ে উঠল ভাবনা। দ্বিতীয় দলের ভাবুকেরা ঠিক এই এই কথাগুলিই ভাবলেন, কিন্তু শ্রমিক-মালিক এই পুরু বিভাজনটাকে সত্য হিসেবে মানতে চাইলেন না। তারা বুঝতে চাইলেন একটা কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়া যায় যেখানে যার যতটা শ্রমাবদান সে ততটা পাবে এবং যুদ্ধবিগ্রহের পরিস্থিতি এলে আপসে মিটিয়ে নেবার চেষ্টা থাকবে। কারণ রাষ্ট্র যখন থাকছে, পুঁজি প্রযুক্তি বাজার যখন থাকছে, সবল থাকছে দুর্বল থাকছে, তখন ঠোকাঠুকি অসম্ভব নয় - আর তেমন তেমন পরিস্থিতি এলে নাহয় মিলেজুলেই ভোগ করা যাক! তাই কল্যাণকামী রাষ্ট্র না হবার কোন কারণ নেই। যদি তা হতে পারে তাহলে কোন পথে হবে সেই নিয়ে শুরু হলো তাদের ভাবনা।

প্রথম ধারাটির বিসমিল্লায় গলদ! শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কথাটিই ভুল। নেতৃত্ব শ্রমিকদের মধ্যেই মালিক-শ্রেণী গড়ে দেবে। তমোরিপু তা করে দেবে। রাষ্ট্র-পদ্ধতি তা করে দেবে। বাজার - পুঁজি - প্রযুক্তি তা করে দেবে। তাই হলোও। লক্ষণ শিট লক্ষণ শেঠ হয়ে জাতে ওঠার ঢের আগেই জর্জ অরওয়েল 'অ্যানিমাল ফার্ম' গড়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কোন পথে তা হয়ে ওঠে। জীবদ্দশায় লেনিনও দেখে গিয়েছিলেন - নিয়ন্ত্রণের পাল্লা গেছে সরে, কিছু 'বিশেষ'শ্রেণী 'শ্রমিক'শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি ঘটে যেভাবে তাকে সংক্ষেপে এইরকম বলা যায় - যন্ত্র চালাতে জানাই যথেষ্ট নয়, উৎপাদিত পণ্যের বিপণন, যার সঙ্গে পুঁজি তথ্য আন্তর্জাতিক বাজার যুদ্ধবিগ্রহ সৈন্য সবকিছু জড়িয়ে রয়েছে, তাদের পরিচালনা করায় 'দক্ষ' ও 'বিশ্বস্ত' 'শ্রেণী'

আসতেই হবে। এরাই জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা তথা কাপিৎসা থেকে সলঝেনিৎসিন প্রমুখ লাখো লাখো 'বিভ্রান্ত' মানুষদের শায়েস্তা করা ও নিধন করার দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকবে। আর্নস্ট ম্যানডেল 'অ্যান ইনট্রুডাকশন টু দ্য মার্কসিস্ট থিওরি'তে সংক্ষেপে এবং 'মার্কসিজম অ্যান্ড অ্যালিয়েনেসন'এ বিশদে দেখিয়েছেন, ধীরে ধীরে সোভিয়েত রাশিয়ায় কিভাবে সংখ্যালঘু কিছু শ্রেণী ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী হয়ে উঠল। সম্প্রতি, ল মঁদ ডিপ্লোমাতিক'এ (৯ অগস্ট ২০০৭) ন্যোম চমস্কি তত্ত্বত সোভিয়েতগুলো, গণতান্ত্রিক গোষ্ঠিপুঞ্জ এবং শ্রমিক-কাউন্সিলগুলো ধ্বংস করে একনায়কত্ব চালু করে বহু-কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেবার জন্য খোদ লেনিন ও ট্রটস্কিকে দায়ী করেছেন, তাঁদেরকে সমাজতন্ত্রের জঘন্য রকমের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ধ্বংস প্রক্রিয়াটি স্টালিনের জমানায় পৌঁছে রাষ্ট্রকে ফ্যাসিস্ট বানিয়ে ফেলেছিল। ঘটনাটি যেভাবে ঘটে তা হলো কমবেশি এই প্রকারে - চারিদিকে শত্রু, অতএব যুদ্ধ-বিষয়ক-প্রযুক্তি, চর সন্দেহে দমন-পীড়ন রাখতেই হবে। দুই, অভ্যন্তরীণ শতধা গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বরকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না, কারণ বুঝিয়েসুঝিয়ে একটা-দুটো লোককে নিবৃত্ত করা যায়, দু-দশ-দুশোটা দলকে ঠেকানো যায় না। বিশেষত প্রশ্নগুলো যখন স্পর্শকাতর - সমাজতন্ত্রের পথে যাওয়া নাকি পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পণ্য বানিয়ে যাওয়া(শান্তির জন্য প্রস্তুতি নাকি পুঁজিবাদ-অপেক্ষা বৃহৎ হয়ে ওঠা অস্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি। তাই 'প্রশ্ন' উঠলে তাদের 'নিরস্ত্র' করতেই হয়। তিন, জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পার্টিজান-পার্টিগুণ্ডাদের তোল্লাই দিতেই হয়। চার, পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে পাল্টা পুঁজি প্রযুক্তি বাজার এবং দখলতন্ত্র বলবৎ করতেই হয়, ফলে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীগুলো 'সবাই সমান'এর মধ্যে থেকেই গজিয়ে ওঠে। আজ ভেনেজুয়েলা যে পারছে, ক্যুবা যে টিকে আছে তার কারণগুলিও এইখান থেকে বুঝে নেয়া যায়। তথ্য-তন্ত্র সেখানেও ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস যে ফেলছে তাই শুধু নয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে সেঁদিয়েও রয়েছে তা - কিন্তু সংঘ আছে (ওঁদের ভাষায় - সোভিয়েত, ওয়াকার্স কাউন্সিল। যাদের হ্যাঁ' না'র ওপর হুগো চ্যাভেজদের এখনও নির্ভর করতে হয়)(ধর্ম আছে (ওঁদের ভাষায় - সমাজতন্ত্র। যে ধর্মবোধে রাষ্ট্রায়ত্ব তৈলশিল্প লাভজনকভাবে উৎপাদন করছে। সেই লাভের টাকা শিক্ষা-স্বাস্থ্যে নিযুক্ত হচ্ছে। বিনিয়োগ নয়, নিয়োগ হচ্ছে। শুধু মুখের কথা নয়, মনে মনে প্রতীতি জন্মেছে যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জাতির মেরুদণ্ড বলিষ্ঠ করবে। যার কিছুমাত্র আমাদের দেশে নেই কারণ সেই ধর্মবোধটিই এখানে উৎসন্নপ্রায়। নেই বলেই রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলো লোকসানে জর্জর)(তেমনই আভাস রয়েছে বুদ্ধত্বের (ওঁদের ভাষায় - মানবতা ও শান্তি)।

কিন্তু সেদিনের সমাজতন্ত্র তা করতে পারে নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, পুঁজিবাদী প্রকরণমত চলেছে আর ফ্যাসিবাদী রীতিতে একদিকে দমন অন্যদিকে মিথ্যা প্রচার করে চলেছে (তাদের দেয়া যে কোনও শিল্প-সংক্রান্ত পরিসংখ্যান যে এতটুকু বিশ্বাসযোগ্য নয় এই কথাটি টফলার বহুবার বলেছেন)। সুতরাং, 'শ্রমিকরাজ' নামটি ব্যতীত - রাষ্ট্রযন্ত্র যেমন 'পুঁজিবাদ'এ চলেছে তেমনই 'সমাজতন্ত্র'তেও চলেছে। এর সঙ্গে যে অস্বস্তিকর প্রশ্নটি উঠে আসে তা কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন নিয়ে। দুই রাষ্ট্রই হিংসা দিয়ে বলপ্রয়োগ করে দেশ ও বাজার অটুট রাখে। এবং হিংসা হিংসাকেই ডেকে আনে, কুটিলতাকে ডেকে আনে, যা দুই রাষ্ট্রেই সমানভাবে ঘটে চলে। পুঁজিবাদের তথ্যগুলো, আমেরিকা কেমন করে শোষণ করে এইসব নিত্য-প্রচারিত, খোদ মার্কিনমুলুক থেকেই তার প্রচার হয়। আর সমাজতন্ত্রে যে তাইই হয়, সলঝেনিৎসিন প্রমুখের লেখায় আমাদের মনে হতো এ বুঝি সি আই এ'র অপপ্রচার - সেই ভুলটা আজ হয়ত সবার ভেঙেছে। পুঁজি প্রযুক্তি বাজার প্রভুত্ব - সব প্যারামিটারে যদিও দু দল ভাবুক দুভাবে ভাবেন, সিস্টেমদুটি কিন্তু একই নিয়মে চলতে থাকে। ফলে বিশ্বকে আমরা নানাভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলি। কল্যাণকামী রাষ্ট্র যে ছকে এগোচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সেই ছক ধরেই এগোচ্ছে। এদিকে যখন আমাদের যুবকেরা 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলছে ও 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম থেকে দূর হটো' বলছে - ওদিকে তখন অনাহারে তিন কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে চিনে, আর অন্য এক পথে বাজার ধরার দিকে জোরকদমে এগিয়ে গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপারটা একই নেটওয়ার্ক ধরে ঘটেছে। এবার সেই পর্বে যাব। অবকাশে, কোনো এক সময়, বুঝে নেবার চেষ্টা করব মার্কস আর মার্কসবাদের ফারাক, মার্কস-কৃত বিশ্লেষণ এক কথা আর মার্কসবাদীদের বাদিত্ব আরেক কথা।

৬

পরিবর্তন ঘটল 'পুঁজিবাদী' রাষ্ট্রে। Space আর Time - এই দুটিকে দখল করার, এককথায় হ্যান্ডস্-অন কৌশলটি, তারা জেনে ফেলে। এর আগে অবধি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলছিল - এ পারমাণবিক বোমা বানাল তো ও বানাল, এ ঐ শিল্প স্থাপন করল তো ও আরেকটি গড়ল, ও মহাকাশে সাতদিন রইল তো এ একমাস কাটাল - ভারী মজার ছিল সেই প্রতিযোগিতা। এমন তথ্যও মার্কিনরাষ্ট্রেই প্রবল যে নীল আর্মস্ট্রংরা নাকি চাঁদে যানইনি, ওটা একটা মরুভূমিতে স্যুটিং করা, সোভিয়েত রাশিয়ার থেকে মার্কিন-বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ তার জন্য নাকি এমন প্রতারণা! কিন্তু টক্কর দেয়া কি মিথ্যাজীবী হওয়া - এসবের ফাঁকে এসে গেল যন্ত্রগণক, এসে গেল কম্পিউটার। এই দিয়ে যে শিল্পসাম্রাজ্যটি আমূল পাল্টে যেতে পারে - সেই জ্ঞানটি কিন্তু রাশিয়ার বহু বহু আগে বুঝে গিয়েছিল 'পুঁজিবাদী' রাষ্ট্রের ভাবুকেরা, এবং রাষ্ট্র তা দ্রুততার সঙ্গে অ্যাডপ্ট করে নিতে পেরেছিল। পিটার ড্রাকার পড়লে বোঝা যাবে মধ্য-পঞ্চাশ থেকেই কম্পিউটিং সিস্টেম নিয়ে আমেরিকায় ভাবনায় জোয়ার। ফলে পুঁজিবাদ যখন তার শিল্পসাম্রাজ্যকে তথ্যসাম্রাজ্যে উঠিয়ে নিয়ে এল এবং বিশ্বকে তথ্যের নিগড়ে বেঁধে নিজ কর্তৃত্ব সুরক্ষিত করে ফেলল তখনও 'সমাজতান্ত্রিক' রাষ্ট্র বুঝেই উঠতে পারে নি যে সময় (Space) ও স্থান (Time)কে কব্জা করে নিয়েছে পুঁজিবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে।

একটি বার্তা বিষয়টির গভীরতা চিনিয়ে দেবে -

A half century ago, around 1950, prevailing opinion overwhelmingly held that the market for that new "miracle", the computer, would be in the military and in scientific calculations, e.g., astronomy. A few of us, however - a very few indeed - argued even then that the computer would have major applications in business and would have an impact on it. These few also foresaw - again very much at odds with the prevailing opinion (even of practically everyone at IBM, just then begining its ascent) - that in business the computer would be more than a very fast adding machine doing clerical chores such as payroll or telephone bills. On specifics, we dissenters disagreed, of course. But all of us nonconformists .. agreed on one thing : the computer would, in short order, revolutionize the work of top management. It would, we all agreed, have its greatest and earliest impacts

on business policy, business strategy, and business decisions। এটি লিখছেন পিটার ড্রাকার। সময়টি লক্ষ করার মতন - ১৯৫০। ভুবন উত্তাল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হট্টগোলে, সেই ভূমিতে ড্রাকারের মতন বুদ্ধিমান পুরুষেরা কাজের জায়গাটায় নতুনত্বের ইসারা পাচ্ছেন। এর ফল কোথায় পৌঁছল দেখা যাক। এই বার্তাটি দিয়েছেন পিটার সোয়ার্জ। সোয়ার্জ গ্লোবাল বিজনেস নেটওয়ার্ক-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পেন্টাগনের পারমর্শদাতা, বহু খ্যাতনামা বহুজাতিক কম্পানির নির্দেশক। তিনি রাশিয়ার ভাঙনের সময় উপস্থিত থেকে লক্ষ করেন যে, ঐ সময়েও, অর্থাৎ আশির দশকেও, গড়পড়তা রুশি মানুষেরা বুঝে উঠতে পারে নি যে পার্সোন্যাল কম্পিউটার একটি সুপার-কম্পিউটারের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে। গর্বাচভ রাষ্ট্রনায়ক থাকাকালীন ওঁর প্রধান-বিজ্ঞান-উপদেষ্টা, মিখাইল ভেইকফকে ইন্টারভিউ করেছিলেন সোয়ার্জ। ভেইকফ বলেছিলেন, তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে স্যাটেলাইট ব্যবস্থাকে গোটা সোভিয়েত দেশ জুড়ে সচল রাখা, কারণ কমিউনিস্টরা পুরনো ধাঁচে ক্ষমতা দখল করে মস্কো রেডিও স্টেশন দখল নিলেও গোটা দেশ জুড়ে একযোগে অপরেট করা স্যাটেলাইট-চক্র মিথ্যা কোনটা আর সত্যি কি ঘটছে সেটি সঠিক জানিয়ে দিতে পারবে। সোয়ার্জ জানাচ্ছেন, ঘটনাটি সেইরকমই ঘটল। সাঁজোয়া বাহিনী মস্কো টিভি স্টেশন দখল করল - অন্যদিকে শুধু সোভিয়েতই নয়, সারা বিশ্ব সি এন এন মারফৎ দেখে নিল ঠিক কি ঘটছে, মানুষের প্রতিবাদ কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠছে। তার আরও টাটকা উদাহরণ আমরা দেখলাম। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাশালী দল বুঝে উঠতে পারে নি নন্দীগ্রামে নৃশংসরাজ চালু করলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্ব তা এক লহমায় জেনে যাবে। ন্যোম চমস্কি থেকে নারায়ণমূর্তি তাকে নিন্দা করবেন, যা হাজার দেয়াল- ধরা-গোয়েবলসীয় লিখনে ফেরৎ করা যাবে না। অর্থাৎ, তৃতীয় বিপ্লবের ধারাটিও একভাবে থেকে যাচ্ছে।

এই যে স্পেশ ও টাইম'এর দখলদারির কথা বললাম - তৃতীয় বিপ্লবের সম্ভাবনাও সেখানে। স্পেশ-টাইম কি দখল করা যায়? সেখানে স্পষ্ট হয়ে আছে সত্য, সঙ্গে সঙ্গে শুভ ও সুন্দর। সেই 'সত্য'কে 'দখল' করবেন যিনি তিনি তো সত্যবান - মিথ্যার আশ্রয়ে যে তা হবার নয়। নয় বলেই ইন্টারনেট একটি বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে ওঠে- ম্যাকডোনাল্ড-বিরোধী-আন্দোলন তার পরিচয়।

ফিরি মূল আলোচনায়। কাকে বলছি স্পেশ টাইম দখল করা? সেটি এমন কি যাতে কিনা মার্কসবাদ-ব্যাখ্যাত সব ধরনের সম্ভাবনা ব্যর্থ করে 'পুঁজিবাদ' আপাতত সুরক্ষিত হয়ে যায় ও 'সমাজতন্ত্র' ভাঙচুর হয়ে মূল পুঁজির স্রোতে ফিরে যায়?

স্পেশের দখলদারি হলো টেলিকমিউনিকেশন দিয়ে ভুবনকে জালবদ্ধ করা। এমন কোন ক্ষেত্র থাকবে না যেটি ফাঁকা থাকবে, অর্থাৎ কম্পিউটার দিয়ে তাকে না বোঝা যাবে। টাইম-এর দখলদারি হলো চব্বিশঘণ্টা কর্মক্ষম থাকা। যা একা মানুষ পারবে না, কিন্তু যন্ত্র পারবে। এই দুটিকে কার্যকর করে কম্পিউটার। তাই, স্পেশ টাইমের ওপর কর্তৃত্ব রাখতে পারলে শ্রেষ্ঠত্বও পাকা হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিষয়ও চলে আসে। তা হচ্ছে, দল বা শ্রেণীর সেরকম কোন প্রয়োজন নেই। পৃথক পৃথক ভাবে একক একক ভাবেও এই বড় সাম্রাজ্যের নাটবল্টু হওয়া যায় এবং ক্রিয়াশীলতাও বাড়ানো যায়। পার্সোন্যাল কম্পিউটার সেই কাজটিই করল।

সব মিলিয়ে দাঁড়াল কি? স্পেশ, টাইম এবং ব্যক্তিজন (দলবিযুক্তির ফলে) - তিনটিকে 'দখল' করে একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়া হলো যার নাম তথ্য-সমাজ রাখা হলো। যে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল মার্কসবাদের ভিত্তি সেই শ্রেণীটিকে ব্যক্তি দিয়ে মুছে দেয়া হলো(concentration and centralization of capital'এর প্রকোপে পুঁজিবাদ নিজের খোঁড়া কবরে ডুববে বলে যে মার্কসীয় ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল তাকে অবৈরী দ্বন্দ্বে শেয়ার করার শান্তিচুক্তি রাখা হলো। সেই গোষ্ঠীতে নবতম সংযোজিত দেশটির নাম হচ্ছে রাশিয়া, যা ঘুরিয়ে হচ্ছিল তা সরাসরি হয়ে গেল! বিশ্ব ইউনিপোলার হয়ে গেল। পুঁজিপ্রভুদের ঐক্যমত্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, আজ রাশিয়া চিন তাতে যোগ দিতে লুটেপুটে খাওয়ায় আর ঝগড়া রইল না, যা কিছু তর্জন গর্জন শুনছি তা আমাদের বামফ্রন্টের শরিকি দলগুলোর মতনই। তাই ভাঙা তো গেলই না, ফিরে নবজীবন পেল পুঁজিবাদ। ওদিকে কিন্তু কর্মহীনতা বেকারত্ব সবই রয়েছে। আড্রিয়ান পিকক এই নিয়ে যে বইটি লেখেন তার শিরোনামটিই অসাধারণ - Two Hundred Pharaohs Five Billion Slaves (London, Ellipsis, 2002)। কিন্তু কোন বিপ্লব নেই। বিপ্লব নেই মানে মার্কসবাদভিত্তিক বিপ্লবটা আর হবে না, যেহেতু কোন শ্রেণী মানসিকতাই তৈরি হচ্ছে না। এবং গ্লোবাল-রাষ্ট্রিয়-সন্ত্রাস একযোগে অপারেট করবে। এখানে, যা গোড়াতে আলোচিত হয়েছে, সেই রিপু-তত্ত্বটি বসালে বুঝে নিতে পারি কেন শ্রেণী তৈরি হয় না - সবাই এক হয়েও সবাই এক হয় না। তামসিক মনোবৃত্তি নিয়ে আমি কি দল গড়তে পারি? বা, দল চলতে পারে? তাই আগুন হয়তবা জ্বলবে, যখন তখনই তা জ্বলবে - পেটে লাথি পড়লে মানুষ ঘুরে দাঁড়াবে। সে আগুন দাবানল হয়ে যেতে পারে এবং তাকে নির্মাণে শুদ্ধ না করতে পারলে সে যে দাবানল হয়েই চারদিক পড়িয়ে খাব করে দেবে, মানবতাই যে লোপ পেয়ে যাবে, এইদিকটাই তাই হয় প্রধান ভাবনা। সেই শুদ্ধি পর্বে কিন্তু পৌঁছে গেছি আমরা সকলে। এই নির্মাণপর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার উদ্যোগটি এখন থেকেই আমাদের নিতে হবে। চলতে হলে দলকে প্রবৃত্তি-শোধনের কাজটা সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের বিরুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে - আশা করব এই ভাবনাটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিপ্লব ঘটাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সাত্ত্বিক-রাজসিক মানুষ - তাদের সহ্য স্থৈর্য্য থাকবে অপরিসীম। ক্রমে জনতা তাদের সঙ্গী হবে, যখন তারা বুঝবে পরিবর্তন তাদের নিজেদের জীবনের পক্ষে অনিবার্যই। সঙ্গী হবে আঠেরোর উন্মাদেরা, পেটে-লাথি-পড়া বিলিয়ন স্লেভেরা। সেই উত্তাল তরঙ্গ যাতে দিশাহীন না হয় সেজন্য সহজিয়া জীবন-সাধনাটি মাইক্রোস্তরেই শুরু করে দিতে হবে।

৭

সুতরাং আমরা পাচ্ছি চারটি কক্ষ। একটি ব্যক্তিজীবনগুলোর বাঁচা-মরার মধ্যে। লোভ আর ভোগ এই রিপুটিকে জ্বালিয়ে প্রকৃতই একটি বিশ্ব চলছে, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আবর্তিত হচ্ছে। চলছে কৃষ্টি সংস্কৃতি রাজনীতি অর্থনীতি সবই। দুই, সেটিকে ভুবন-জুড়ে নিয়ন্ত্রণ করছে যে শক্তি সে স্পেশ আর টাইমকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং তা কার্যকর করার চেষ্টা করছে ব্যক্তিক স্তর দিয়েই। মার্কসের পক্ষে এই অবস্থাটি কল্পনা করা অসম্ভব ছিল, ফলে তাঁর সৃষ্ট মতবাদ এই অবস্থায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের যুগে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখার মতো (এই কথাটি বলছেন অ্যালভিন টফলার)। কিন্তু

বলার কথা এও, টফলার হয়ত জানেন কিন্তু বলছেন না (এ সম্বন্ধে আমাদের এক বন্ধুর নজর হচ্ছে, বিশ্বে সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্রগুলির বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন যাঁরা তাঁদের অনেকেই ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী তো ছিলেনই, অধিকাংশই আর্লি অথবা প্রাক্তন ট্রটস্কাইট! তবে কি ইতিহাসে শকুনিমামাদের আবির্ভাব ঘটছে? টফলারও আর্লি-ট্রটস্কাইট - মার্কস কতটা তীক্ষ্ণ তা কি তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারে?), তাই জানেন না তা নয় কিন্তু তিনি বলছেন না যে, দাস ক্যাপিটাল - গ্রুন্ডরিশে - পারি খসড়ার রচয়িতা যে মার্কস যে যুক্তি দিয়ে তদানীন্তন পুঁজির নগ্ন রূপটি চিনিয়েছিলেন - সেই পুঁজি আজ যে পথ পার করে দুশো ফারাওয়ের কুক্ষিগত হলো তা বুঝতে আমাদের মার্কসেই ফিরতে হবে বারবার।

তথ্যবিপ্লবের চলাটা কোথায়? তার চলা তিনদিক ধরে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক জ্ঞানকে কম্পিউটারের মধ্যে মজুদ রাখা(বৈদ্যুতিন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা এবং জৈব প্রযুক্তিতে নামা। এই তিনটি দিকে গুণগত একটি নতুনত্ব এল - এবং এটাই পুঁজি প্রযুক্তিকে পুঁজিবাদের অনুকূলে জিইয়ে রাখল। এই তিনটিতে কর্তৃত্ব থাকলে ব্যক্তিগত রুচিচাহিদা তো বটেই, এমনকি ক্ষুৎপিপাসাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। নিয়ন্ত্রণ মানে সহজ বাংলায় শোষণই। অস্বীকার করি কি করে? জল এখন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা দিচ্ছে। জিন-কারিগরি-কৃত খাদ্য একটা দুটো আকালের পর রমরমিয়ে ঢুকে যাবে, আর আকাল খুব দূরে নয়, দু-চারটে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম্য-উন্নয়ন করতে পারলেই তা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। অনুমানটি যৌক্তিকও যখন শুনি গেটস্-ফাউন্ডেশন আফ্রিকার দারিদ্র্য নিরসন তথা খাদ্যে স্বনির্ভর হবার জন্য জিন-ঋঙ্কৃত বীজ ব্যবহারের অনুকূলে অর্থ ঢালছে! তাই প্রতিটি মানুষের ওপর নজরদারি বলি আর খারাপ ভাষায় শোষণ বলি, যাই বলি, অর্থটা একই থাকে। আর এটিকে যদি পুরোপুরি তাঁবেয় রাখা যায়, যদি যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে সবকিছুকে পুঁজি ও প্রযুক্তির আওতায় আনা যেতে পারে। এটাই তথ্যবিপ্লব। এখানে, জ্ঞান (knowledge) হচ্ছে ভূমি, অর্থনীতি হচ্ছে সৌধ (টফলার)। মার্কসীয় ধারণায় অর্থনীতি হচ্ছে ভূমি(বাকি সব, জ্ঞান, সংস্কৃতি, সব, হচ্ছে সৌধ। সেটি উল্টে গেল এই পরিবেশে। সেখানেই শেষ নয়, জ্ঞানের একটা সীমাহীন চয়েস কম্পিউটার মারফৎ সর্বত্র চারিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রাম, দুর্গম মরু কোন বাধা নয়। একজন ড্রপ-আউটের পক্ষে বিল গেটস্ বা নারায়ণমূর্তি হতে কোনই বাধা নেই।

এতে একটা অন্যরকমের দুর্গতিও হয়। স্যোসাল ফ্যাব্রিকগুলো এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে যায়। এর শেষ কোথায় তা কোনোভাবেই অনুমান করা যায় না। যা দেখা যায়, তা হচ্ছে, কনসিউমারিসম (যাকে সবখানে ছড়িয়ে দেয়া এই সাম্রাজ্যের লক্ষ) যেমন যেমন পেনিট্রেট করে, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের দিকগুলো তেমন তেমন ফেটে যায়। আবার অন্যদিকে, সর্বত্র, একটা নতুন মানবতাও সচেতনভাবে ঢুকে পড়ে। নন্দীগ্রামের নৃশংসতা লহমায় যেমন প্রতিবাদের ঝড় তুলে দিল, তেমনই আরেকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। চিন-সরকার পঁইত্রিশ হাজার ওয়েব-পুলিশ (এরা ইন্টারনেটে নজরদারি করে) নিয়োগ করেও যখন প্রতিবাদী কণ্ঠদের দমাতে পারছে না, তখন গুগল-এর সঙ্গে একটা রফায় আসে, পাহারার কাজটা গুগলকে দিতে চাইছে। এতে চিন বুঝতে পারছে কিনা জানি না, ঘরের শত্রুদের নাহয় নিকেশ করা গেল, কিন্তু গুগল-মারফৎ বাইরের শত্রু অর্থাৎ আমেরিকার কাছে যে যাবতীয় তথ্য জমা হবে সেই জাল কেটে কি বেরোতে পারবে তারা? এসবের মধ্যে তাই থেকে যায় তৃতীয় বিপ্লবের বীজ, যা, সংস্কৃতির মতই, কোনদিন মরে না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে গুটিয়ে থাকে, কখনও বা দূর্বার মতন ছড়িয়ে যায়। সে নির্বিকার। অলক্ষে ও অলঙঘনীয় গতিতে এগিয়ে চলে। তার ব্যাখ্যা পেতে আমাদের সত্ত্ব-রজ-তম কনসেপ্টে যেতে হয়।

স্যোসাল-ফ্যাব্রিকস্ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবার ফলে শ্রেণী-বিভাজিত এতৎকালীন অবস্থাটি, তার যেমন যেমন প্যাটার্ন বা স্তর ছিল, সেগুলি এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ওলটপালট খেয়ে যায়। আর এটিই অন্যতম কারণ এন জি ও'দের সামাজিক বাজারে ঢুকে পড়ার। এতে করে 'শ্রেণী' ব্যাপারটি আরও ডি-স্ট্রাকচারড্ হয়। গ্রামে বিদ্যুৎ আসা মানে টি ভি আসা, বিদ্যুৎ নেই মানে অন্তত মোবাইল থাকা। এই দুই দিয়ে ভোগ-সংস্কৃতি ব্যক্তিকে অন্যের থেকে পৃথক করে ফেলে। এবং ভোগ করা না করার ওপর জাতে ওঠার একটা ব্যাপার জোরের সঙ্গে জেঁকে বসে।

৮

এর শুরুটা কবে থেকে? সঠিক বলতে গেলে, পঞ্চাশের শেষ, ষাটের গোড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং য়ুরোপীয় শিল্পোন্নত দেশগুলোর গতিপ্রকৃতি এমন ইঙ্গিত দিল যে, ১. যুদ্ধোত্তর প্রাচুর্য, ২. ঝগড়াঝাঁটির মধ্যেই যৌথভাবে ভোগ করা ও দর-কষাকষি, ৩. কল্যাণকামী রাষ্ট্র না হলেও আগের মতন শ্রমিক-মালিক পুরু বিভাজন যেন থাকছে না। অতীতের ট্রটস্কিপন্থী ড্যানিয়েল বেল যেন মার্কসবাদের অবসান দেখতে পেলেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব-সংঘাত তো কম নেই, হয়ত রয়েছে শান্তিকল্যাণ কিন্তু অশান্তি অবলুপ্ত এমনটা বলা যাচ্ছিল না। এল ষাটের শেষ, সত্তরের শুরু। দেখা গেল - ১. উন্নয়ন ডুবে যাচ্ছে, আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে, ২. ভিয়েতনামে মার্কিন নির্যাতন ও নাকানিচোবানি খাওয়া, ৩. কৃষ্ণাঙ্গ-বিক্ষোভ ও শহুরে ঘেটোগুলো দুর্দান্ত অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে, ৪. অটোমোবাইল কারখানায় ক্রমিক শ্রমিক অসন্তোষ, ৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত বিক্ষোভ, ৫. সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন ও জনজীবনে নেশা-ড্রাগের রমরমা, ৬. নারীমুক্তি-আন্দোলন, ৭. পরিবেশ রক্ষার জিহাদ। সব কটা একসঙ্গে গজিয়ে উঠল। মার্কসপন্থীরা বুঝলেন, পুঁজিবাদ টলোমলো। ড্যানিয়েল বেল একটু অন্যরকম বুঝলেন। বেল বুঝলেন মার্কিন-রাজত্ব নতুন দিকে পৌঁছে গেছে, পেছনে ফেলে যাওয়া জঞ্জালযন্ত্রণাই ঐ ঐ ক্ষোভের কারণ। ঠিকটা তাহলে কি? ওদিকে 'টালমাটাল'এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে পরিবর্তনের মোড় কোনদিকে তা বোঝার গবেষণা।

বিশ্বের সেরা সেরা প্রতিষ্ঠানগুলো এই 'পরিবর্তন'কে কতভাবে মনিটর করার কাজে নেমেছিল তার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দিচ্ছি। হারভার্ডে আই বি এম-আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-বিষয়ক প্রোগ্রাম (১৯৭১) বলছে 'প্রযুক্তিক সভ্যতা'য় পৌঁছেছি। ১৯৬৮তে পিটার ড্রাকার বলছেন জ্ঞান-সভ্যতার দোরগোড়ায় পৌঁছেছি। বিগনিউ ব্রেঝনিস্কি তখন মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা বিভাগের অন্যতম পরামর্শদাতা। তাঁর গবেষণা, ১৯৭০ সালে, বলছে টেকনিট্রনিক যুগ শুরু হয়েছে। ১৯৬৭তে র‍্যান্ড কর্পোরেশন ও হাডসন ইনস্টিট্যুটের যৌথ গবেষণায় হেরম্যান কাহ্ন ও অ্যান্টনি ভিয়েনার বলছেন, উন্নীত হচ্ছি 'যুগ ২০০০'এ - যা প্রযুক্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে ফেলেছে। গবেষণা চলছে জাপানেও। অংশ নিচ্ছেন অ্যাকাডেমিশিয়ানরা, সরকারি বিশেষজ্ঞরা এবং কর্পোরেট ম্যানেজারেরা। আমেরিকান গবেষণাগুলো সেখানে পৌঁছে গেছে। তাঁরা তাদের নিয়ে নিজেদের মত বুঝতে লাগলেন।

তাদিও উমেশাও, কেনিচি কোহিয়ামা, য়ুজিরো হায়াশি এবং য়োনেজি মাসুদা যৌথ-গবেষণায় 'জোহো সাকাই' বা তথ্যকেন্দ্রিক সমাজে উন্নীত হবার ছবিটা দেখালেন। তেশা মরিস ও মরিশ-সুজুকি আয়োজিত গবেষণায় ধরা গেল, যে 'জোহো সাকাই' বা তথ্যরাজত্বে পৌঁছতে চলেছি সেখানে, অফিস ফ্যাক্টরি ও ক্রেতাসাধারণের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিচ্ছে কম্পিউটার, তার কাজটা এবার থেকে জটিল অঙ্ক কষা শুধু নয়, আরও অনেক কিছুকে এক-জানলায়-সাজিয়ে দেবার মজা, যাতে কিনা যে কোনও উৎপাদনকে যতটা 'শিল্পমুখী' ভাবা হচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি 'তথ্যনির্ভর' করে দেবে।

ভাবনাদের এক করলেন বেল। মনে রাখা দরকার, প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তা-ব্যবসার জগতে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশ্বে সেরা স্থান নিয়ে থাকে। যে কোন বিদ্বান মানুষের যাত্রাপথ এইসব প্রতিষ্ঠানই। এরাই পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিক্ষা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে থাকে। এদের মারফৎ সি আই এ বা পেন্টাগন গবেষণা চালায়। ভারতবর্ষের নামি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এদের দেয়া মডেল ফিট করিয়ে নিজেদের স্থানিক-তথ্যদের মার্কিন ভাঁড়ারে জোগান দেয়। এ নিয়ে আমি শ্রয়ণ'এর ১৯৯৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় লিখেছিলাম(সম্প্রতি দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবলভাবে কলম ধরেছেন তাঁর নানা লেখায়। কথাগুলো বলা হচ্ছে এই কারণে যে, বিশ্ব এক অর্থে যেমন আমার ওপর নির্ভরশীল, যে আমি'রা নিঃস্বার্থে পারি বিশ্বকে আমার পথে আনতে। অন্যদিকে, বিশ্বের ডমিন্যান্ট স্বার্থতান্ত্রিক চলনে এই প্রতিষ্ঠানগুলিরই প্রভাব সর্বাধিক, কাজেই এদের গবেষণালব্ধ তথ্যদের গ্রাহ্য করতে হয় যদি এই দুনিয়া সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা পেতে হয়। ড্যানিয়েল বেল এইসব তথ্যদের এক করলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো - ১. পণ্যোৎপাদন থেকে তথ্য-নিয়ামক-রাষ্ট্রে পৌঁছচ্ছে শিল্পোন্নত দেশেরা, ২. গতরখাটা শ্রম থেকে বুদ্ধি-ব্যবহার্য শ্রমসভ্যতায় যাচ্ছে রাষ্ট্রগুলো, ৩. সামনের দিনগুলোতে কি ধরনের পণ্য প্রয়োজন তা বোঝা এবং সেইমত উৎপাদনের মূল্যায়ন করা বেশি প্রয়োজন, ৪. নতুন একটা প্রযুক্তিক ও বৌদ্ধিক 'গেম-থিওরি' এবং সিস্টেম-বিশ্লেষণী-ক্ষমতার উদ্ভব হয়ে গেছে যা কম্পিউটারের মধ্যে কর্মক্ষম অবস্থায় ঢোকানোও গেছে।

এতে কোন্ নতুনত্ব ঘটল? অনেকদিকে অনেককিছু ঘটল। তৎকালীন যে শ্রমিক-মালিক নিরেট বিভাজন যা বাস্তবেই ছিল দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর বিশেষ ('বলতে পারো বড়োমানুষ মোটর কেন চড়বে? / গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?') - এটা ফিকে হয়ে গেল। দুটোই শ্রেণী এবং স্বার্থে দুজন বিপরীতমুখী, তাই যুযুধান তারা - এই ছবিটা আর রইল না। মাঝে অনেক রকমের 'শ্রেণী' ঢুকে পড়ল। 'নিচতলা' থেকে 'ওপরতলা'য় ওঠার চ্যানেল খুলে দিল প্রযুক্তি। ম্যাক্স ভেবার পুঁজিবাদের ঐ কঠোর বিভাজনটা মার্কসীয় চোখ (যে বিষয়টি বিধৃত হয়েছে ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে) দিয়ে দেখেই কল্যাণকামী রাষ্ট্র কল্পনা করেছিলেন যেখানে পুঁজির মালিক আর পুঁজি-মালিকানার মধ্যেই স্থান নেবে আরেকটি সম-সক্ষম পেশাদার শ্রেণী (ড্রাকারের ভাষায় এটিই ম্যানেজারিয়াল ক্লাস), যার মূলটা এসেন্সটা শুধু যে বিত্তবান মহলেই আবদ্ধ থাকবে তা নয়, মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে তারা উঠে আসবে (যা আজ আকচার হচ্ছে, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনায় ভাল ফল করে আই আই টি, আই আই এম ইত্যাদি পার করে মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে ঢুকছে, ক্রমে উঁচু আসন দখল করছে)। কারণ বিত্ত নয়, মেধাবিবেচ্য সভ্যতায় মেধা যে প্রান্ত থেকেই আসুক তা মর্যাদা পাবে। এটাই ঘটা স্বাভাবিক। এইটি যে বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে সেদিকে বেল-ড্রাকাররা প্রথম নজর দিলেন। দ্বিতীয় দিক হলো, যে কোনও এন্টারপ্রাইসে ব্যুরোক্রাটতন্ত্র ঢুকে গেল। কারণ উৎপাদনে শ্রমিক মালিকই শেষ কথা নয় - রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ম্যানেজার-ব্যুরোক্রাট শ্রেণীগুলোকে থাকতেই হবে। বিশেষত, ঐ যে বলা হলো, ভাবী-অবস্থা বুঝে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষ একদল মানুষের প্রয়োজন, যারা মূলত বৌদ্ধিক শ্রমই দেবে। সর্বোপরি, স্টক-হোল্ডিং'এর ক্ষেত্রটি খুলে দেয়া হলো, মালিকানা ছড়িয়ে দেয়া হলো, শেয়ার মারফৎ পুঁজি সর্বসাধারণে ছড়িয়ে দেয়া হলো। ফলে 'নিচ' তলার 'ওপর'এ ওঠার, 'ওপর'এর মুনাফা 'নিচ'এ যাবার সুযোগ ঘটল। মটরগাড়ি মানে বড়লোক আর গাড়ি-চাপা-পড়া মানে গরীব লোক এমন সুকান্তি-ভ্রম সংশোধিত হতে হতে বুদ্ধ-বিক্রমে এক লাখি মোটর-গাড়ি হয়ে গরীব-রতন হতে পারল!

সেক্ষেত্রে শ্রমিকনেতাদের খোলা থাকে দুটো পথ। ১. নির্বোধের মত আগুনে ঝাঁপ দেয়া, যা 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বলে কেউ কেউ দিয়েছিল। ২. সুকৌশলে, কাজ-খোয়ানো-লোকদের খেপিয়ে, লোককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে, এবং মালিকের অর্থগম সুনিশ্চিত করে নিজেদের 'ওপর'এ ওঠার রাস্তা পরিষ্কার করা। পশ্চিমবঙ্গে চটকল নিয়ে অনুসন্ধান করলে এই চিত্রটি পরিষ্কারভাবে বুঝে নেয়া যাবে। বিশ্ব জুড়ে এমন বিপ্লবীও বিপুল যারা বলবে খাম্মাম আন্দোলনটা গণতান্ত্রিক আর নন্দীগ্রাম ব্যাপারটা গণতান্ত্রিক সরকারের বিরোধিতা। তৃতীয় কোন পথ এই মার্কস-বেল-ভেবার-ড্রাকার-বিশ্লেষিত ধারায় নেই। নেইই।

ছিল তা একমাত্র গান্ধিতে, এবং গান্ধিতে তা ছিলও না। গান্ধিভক্ত সেই মানুষ যিনি, য়ুরোপে গান্ধিকে পরিচিত করাতে চাইছেন, কিন্তু যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক শিবির ও যুদ্ধপিপাসু সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শিবির ঐ অর্ধনগ্ন ফকিরটিকে কিছুতেই য়ুরোপবাসীর নজরে আনতে চাইছে না, তাই বাধা পাচ্ছেন সেই গান্ধিভক্ত পুরুষ, রম্যাঁ রল্যাঁ যাঁর নাম, যিনি গান্ধিকে খৃস্ট-তুল্য বলে স্বীকার করতে চাইছেন - সেই ভক্তপুরুষ অনুভব করছেন মানবজাতির একমাত্র আশা 'গান্ধি' সত্যই কিন্তু, তথাপি, রল্যাঁ বুঝতে পারছেন না পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইটা গান্ধি কিভাবে লড়বেন, কিভাবে হৃদয়-পরিবর্তন করবেন পুঁজির কারণ পুঁজি যে নৈর্ব্যক্তিকভাবে হিংস্র হয়ে গিয়েছে। যে মানুষ নয়, মনুষ্যত্ব যার মধ্যে নেই, যে একটি নিষ্ঠুর প্রাণহীন সিস্টেম, তার হৃদয় তো নেইই তাহলে তার হৃদয় পরিবর্তন কোন্ পথে করবেন গান্ধি - বুঝে উঠতে পারছেন না রল্যাঁ। উত্তরটা আজ আমাদের জানা, প্রশ্নটা কিন্তু সেদিনের পুরনো।

লক্ষ্যণীয়, বেল, এই তথ্যসমাজটি সাবালক হতে করতে আরো তিরিশ বছর লেগে যাবে বলে অনুমান করেছিলেন। সেই হিসেবে দু'হাজার সালে তার যৌবন পাবার কথা। আজ আমরা শিখছি, রল্যাঁ-অনুভূত পুঁজিবাদ আরও আরও সিস্টেম-প্রকোষ্ঠে আরও আরও হিংস্র হয়ে গেছে। আজ আমরা দেখছি, বেল'এর পুঁজি-প্রভুদের শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা একজন সি ই ও'র মাইনে গত দশ বছরে ২৩.৭৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪.৮ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ঐ একই মার্কিন দেশের শ্রমিকের সাপ্তাহিক মাইনে বেড়েছে মাত্র ৩.৫ শতাংশ (১৯৯৬ থেকে ২০০৬এ) । এবং তথ্য বা জ্ঞান যেখানে প্রধান পুঁজি, শিক্ষাও সেখানে ব্যবসায়িক মদত ছাড়া অকেজো। তারই প্রতিফলন মেলে যখন দেখি মার্কিন কলেজগুলোতে

কলেজ-প্রেসিডেন্টের মাইনে ১৯৯৬ সালের তুলনায় ২০০৬ সালে বেড়েছে সাত গুণ, যেখানে শিক্ষক-অধ্যাপকদের মাইনে বেড়েছে পাঁচ শতাংশ। কারণ, বাজার ধরতে স্পনসর আনতে শিক্ষাকে বাণিজ্যের সঙ্গে জুড়তে না পারলে কলেজ চলবে না - প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি শিক্ষাজীবী সি ই ও'র প্রয়োজন তো সেইখানে।

তাই ক্ষোভ থাকছে কিন্তু বিপ্লব নেই। বিপ্লব মানে মার্কসবাদীদের চটকানো শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলছি। অন্যদিকে কিন্তু একটি বিশাল মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত বাহিনী তৈরি হয়ে চলেছে। অতীতে তারাই ছিল সংগ্রামের পুরোধা, ভবিষ্যতেও তারা তাই হতে পারে এমন আশঙ্কা সাম্রাজ্যপ্রভুদের রয়েছে। কিন্তু পথ কোনদিকে? সশস্ত্র? নাকি নিরস্ত্র? অবশ্যই অহিংস হবে সে পথ। হত্যা হননের স্রোতকেই বয়ে আনবে, তাই হনন কোন পথ নয়। পথ হলো - দৃঢ়তার সঙ্গে 'না' বলতে শেখা, আমি তোমাদের পথে চলব না(এবং 'হ্যাঁ' এইটাই পথ, আমি করছি তুমি দেখ - এই দুটো যখন শুরু হয়ে যাবে, প্লাবন তৈরি হবে তখনই। হনন কোন মীমাংসা নয়।

৮

যা দেখলেন ড্যানিয়েল বেল তার ছবিটি এবার বোঝা যাক। এতদিনের বিবেচ্য বিষয় ছিল পণ্য-উৎপাদন। এখন ছবিটা অন্যরকমের। আমি একটা পণ্য বানালাম। সেটা শেষ কথা নয়, বরং শুরুর কথা। পণ্যটার বিপণন যত দ্রুত (এখানেই চলে আসছে সময় ও স্থানকে নিয়ন্ত্রণ করার ভাবনা) হবে ততই ভাল (ইউ এস এস আর' মার্কিনিদের মত মারপিট গুণ্ডামি থেকে শুরু করে মহাকাশ অবধি ধাওয়া সবই করেছে কিন্তু এই মজার অঙ্কটা বুঝে উঠতে দেরি করে ফেলেছিল(যে ভুলটা এখন আর তারা করছে না, জি-এইট মহল্লায় নাম লিখিয়ে দুনিয়াকে মিলেজুলে লুটেপুটে খাওয়া চালু করে দিয়েছে)। এইখানে প্রয়োজন পড়ছে তথ্যের। একই পণ্য যেমন দীর্ঘদিন তার জৌলুষ রাখতে পারে না, মানুষ একই ধরনের জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায় না, তেমনই বাজারও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। চাহিদা আর যোগানও ভিন্নমুখী। ফলে কোথায় বাজার তৈরি হচ্ছে, কোন পণ্যের বাজার তৈরি হচ্ছে, পণ্যের বৈচিত্র্য কোন বাজারে কি রকম, কোথায় কাঁচামালের যোগান বেশি, কোথায় শ্রম সস্তা - এই গোটা বিষয়টিকে যে যত দ্রুততার সঙ্গে কব্জা করতে পারবে তার বাজার-ব্যবসায় অগ্রণী হবার সম্ভাবনা তত বেশি। ১৯৭৮'এ জাপান এবং ইউ এস কমিউনিকেশন স্পনসরড্ গবেষণায় এই নতুন দিকটির নাম রাখা হলো information society। পুঁজি-প্রযুক্তি-শিল্প-বাজার যখন এইদিকে তার অভিমুখ বদলে ফেলল, স্বাভাবিক পুরনো প্রথাগুলোর সঙ্গে তার ঠোক্কর লাগতে শুরু হলো। মনে হলো, পুঁজিবাদ অভ্যন্তরীণ সংকটে ভেঙে যেতে বসেছে। আসলে মোড়টা গেছে ঘুরে। তাতে, প্রতিবাদ হতে পারে, প্রতিরোধ হতে পারে, সেই প্রতিবাদকে সাম্রাজ্যিক প্রভুরা স্পনসরও করতে পারে (পারে বলছি কেন, করেও), কিন্তু 'শ্রেণী-সংগ্রাম' হতে পারে না, কারণ শ্রেণী-মানসিকতা ব্যাপারটাই নেই। তমো-তত্ত্ব প্রয়োগ করলে বোঝা যায় কেন জোর দিয়ে এই কথাটা বলছি। এই যে মোড়টা ঘুরল - হয় এতে তাল দিয়ে চলতে হবে (এদেশে সব পার্টিই এই রফা নিয়ে চলছে)(নাহলে তৃতীয় যে চলাটি, যে শান্ত বৈপ্লবিক চলাটি ধৈর্য ধরে চলছে তাতে সচেতনভাবে থেকে যেতে হবে (সচেতন শব্দে আমরা জোর দেব)। দ্বিতীয় যে চলা, যা আসলে যন্ত্রবাদ-পুঁজিবাদেরই নামান্তর (লেনিনই মীমাংসা করে দিয়েছিলেন যখন তিনি কবুল করেন electrification is socialism), সেই চলার ধারাটি ছিল - শিল্পসাম্রাজ্যে প্রবেশ করা ও অধিপতি হওয়া।

তেমন করেই দুটি দেশ এগোচ্ছিল। চলার পথে এল কম্পিউটার। দেখা গেল তা দিয়ে পণ্যপ্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিপণন-ব্যবস্থা সবকটিকে আরও সাবলীল করা যায়। তাকে গ্রাহ্য করে পুঁজিবাদ উন্নীত হলো তথ্যরাজে। সমস্যা তখন তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোয় - যখন তুমি শিল্পযুগে, বাজার ধরতে তোমাকে ঐ একই পথে হাঁটতে হবে, নাহলে সংকটে পড়বে আসলে তুমিই। তুমি ভেঙে যেতে পার - ধনীরা গরীবদের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে চাইবে না। ইউরেনিয়াম-ধনী অঞ্চলগুলো তেমনকরেই ইউ এস এস আর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে চাপ দিতে লাগল। অনুমান করা হচ্ছে চিনের মধ্যেও এমন একটা ধনী-অঞ্চল তৈরি হয়ে গিয়েছে যারা হিন্টারল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছে না। তাইই হয়েছিল ইউ এস এস আর'এ। একদিকে বিত্তবানদের চাপ, অন্যদিকে মুক্তবুদ্ধি মানুষদের শুভবুদ্ধি সঞ্চারণের চিরকালীন প্রয়াস (যারা তৃতীয় বিপ্লবের পথিক) - দুয়ের চাপে ভাঙল সোভিয়েত দেশ। এও লক্ষ্যণীয়, তৃতীয় বিপ্লবের অংশীদার হয়েও মিখাইল গর্বাচব (দ্র - স্বাশ্রয়ভাবনা, শ্রয়ণ-সংকলন, ২০০৫) দেশকে টলস্টয়-গান্ধি-রবীন্দ্রনাথের পথে নিয়ে যেতে পারলেন না। না পারাটা, আমাদের বিচারে, যথার্থ। কারণ, এই বিপ্লব ও এই বিপ্লবে সৃষ্ট জগৎ পিরামিড-স্ট্রাকচার্ড অথবা ভার্টিক্যাল হবে না, হবে হরাইজন্টাল - অসংখ্য প্রকৃতি-নির্ভর গ্রামীণ-পড়শি-স্নিগ্ধ অযুত-নিযুত ছোট ছোট ইউনিটকে গড়ে উঠতে হবে, যা মাটি জল বায়ু আকাশ বাতাস রৌদ্রকে পর্যাপ্তভাবে মেখে নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর সেটি একদিনে সম্ভব নয়, লক্ষ বছরও লেগে যেতে পারে।

অন্যদিকে তেং শিয়াও পরিচালিত চিন দ্রুততার সঙ্গে, প্রধানত প্রবাসী-চিনা-কমিউনিটির প্রভাবশালী-চাপে পুঁজিতন্ত্রে নিজেকে সঁপে দিল। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদাটি কিন্তু বার্গেইন করে। এই বিষয়টি সংক্ষেপে বলে নেয়ার দরকার আছে। চিনের প্রাইম জমি দখল করার দিকে নজর ম্যাল্টিন্যাশনালদের প্রায় এক দশক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু চিনা সরকার শুরুতেই একটা বার্গেইন করে নিতে পেরেছিল। একেবারে প্রথম পর্যায়ে চিন জোর দিয়েছিল শিক্ষা স্বাস্থ্য ও খাদ্যে স্বনির্ভর হবার ওপর - সেটা মিটিয়ে তারা গাড়ি ও সৌখিন পণ্যে সায় দেয়। এই সায় দেয়াটা তাদের মত ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রে প্রথম প্রথম সহজে ঘটলেও আজ এক পা-ও এগোতে পারছে না। সেঝ-এর জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে যাওয়ামাত্র কৃষকেরা প্রবল বাধা দিচ্ছে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে প্রাণও হারাচ্ছে, এবং মৃত্যুর মিছিল এতই প্রলম্বিত যে আর এগোবার সাহস তাদের নেই। ২০০৭এর পর থেকে কোনও ছোট বড় সেঝ সে দেশে হয় নি। মাল্টিন্যাশনালরা এখন সেখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে সিঙ্গাপুর তাইওয়ান মালয়েশিয়ার দিকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছে। এই বিষয়টি জানা প্রয়োজন দুটি কারণে। এক, এখানকার নির্বোধ রাজনীতিবিদরা যেমন মটরগাড়িই শিল্প বলে হল্লা করছে - ওখানে প্রথমে তা কিন্তু হয় নি। দুই, একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রও নমনীয় হতে পারে যদি প্রতিরোধ হয় সৎ।

বড়দের এই হাল। ছোটরাও অগত্যা ঝাঁকের কই হয়ে উঠল। কিউবার ক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কটা অন্যরকম হলো। এই ইতিহাসটি জানতে আমাদের মার্কিন সংস্কৃতি নিয়ে সামান্য কথা সেরে নিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকা। আগে যেমন বলেছিলাম, যে, ধ্বংসভস্ম থেকে লাভের কড়ি তারা তুলে

নিয়েছিল ভালই - সেখানে যা বলা হয় নি তা হলো, আপামর মার্কিন মানুষের অসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বনির্ভর হবার বিপ্লবটিও কিন্তু চলেছিল, যা আমাদের ভাষায় তৃতীয় বিপ্লব বলে পরিচিত হচ্ছে বারবার। সেইসময়, মার্কিন দেশে, দুটো শ্লোগান বলি কি শপথ বলি, দুটো পন্থা সর্বস্তরের মার্কিনিরা সর্বদা মেনে চলার চেষ্টা করতেন। এক, গাড়ি খালি করে যাওয়া নয়। একা যাওয়া মানে হিটলার তোমার সওয়ারি হয়েছেন - এটা ছিল খুবই পপুলার শ্লোগান সেদিন। অর্থাৎ, তেলের সাশ্রয় করো, ফাঁকা গাড়িতে চড়ো না, সওয়ার রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করো। প্রায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ তেলের সংকট এতে মিটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় উদ্যোগ ছিল - সব্জিবাগান করো - করিডোর ব্যালকনি বারান্দা বাড়ির সামনে-পেছনের ফাঁকা জায়গা, সবখানে, বাগান করো, ফসল ফলাও। জনগণেশ অচিরেই মানুষকে খাদ্য-সংকট থেকে মুক্তি দিতে পেরেছিল।

আর সেই পথটাই নিল, সোভিয়েত-রাষ্ট্র ভেঙে যাবার পর, কিউবা। রুশিরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওখান থেকে আমদানি হওয়া সার ও ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। এদিকে মার্কিন-রাষ্ট্র জলপথ আগলাচ্ছে। এখন পথ দুটো। হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ(নাহলে তৃতীয় বিপ্লবে যাওয়া, স্বনির্ভর হওয়া। তারা সেইটিই করল। আজ গোটা ল্যাটিন-আমেরিকা তাই করে চলেছে। কিউবার আরও একটি সাফল্য হলো সংঘশক্তি - যাকে বলব সংঘম্ শরণম্ গচ্ছামি। ইকলজিস্টে পাওয়া একটি তথ্যে জানছি, যে উন্নত স্বাস্থ্য-পরিসেবা পেতে একজন মার্কিনিকে বছরে ৫০০০ ডলার বিমা করতে হয়, সেই মানের পরিসেবা (কিউবার স্বাস্থ্য-পরিসেবা বিশ্বের অন্যতম সেরা) একজন ক্যুবান পান বছরে মাত্র ২০০ ডলারের বিনিময়ে। সংঘশক্তির এ এক অসামান্য দৃষ্টান্ত। এবং ভেনেজুয়েলা এই কিউবান-স্বাস্থ্য-পরিসেবা এবং ক্যুবান-চিকিৎসকের সহায়তা নিয়ে নিজের দেশকে স্বাস্থ্য-সবল করে তুলছে।

অরবিন্দ বলতেন, তুমি একবার যদি মহাজাগতিক প্রশান্তিকে (উপনিষদের সেই প্রখ্যাত মন্ত্রটি স্মরণীয়, যা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ মনন করতেন - শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ - সেই শান্তিকে) নিজের মধ্যে আনতে সক্ষম হও তাহলে বাকি সংকট মেটাতে বেগ পেতে হবে না, অন্তত ভয়শূন্যতা থাকবে। এই শান্তি পাবার অরবিন্দীয় পদক্ষেপ হলো - মনে ভেবে নিতে হবে মহাজাগতিক শান্তি রয়েছে আমারই ওপর, তাকে মন-নিবিষ্ট করে ডাকা - শান্তি শান্তি শান্তি। যত দৃঢ়তার সঙ্গে, তেজের সঙ্গে, এক মনে, বিক্ষেপহীন মনে, ডাকতে পারব, ক্রমেই অনুভব করতে পারব একটি শান্ত-ভাব প্রথমে মাথা তারপর সারা অঙ্গকে শীতল করে দিচ্ছে। একদিনে তা না হতে পারে, না হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু চেষ্টা করতে থাকলে তা পাওয়া যাবে। তখন, অরবিন্দ-মতে, ঐ শান্তিই নিজেকে রক্ষার জন্য ঐ মানুষটিকে রক্ষা করে যাবে। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়' - এই নির্ভীক অথচ শান্ত যাত্রা একজনের জীবনে বারবার নেমে আসবে, কারণ আত্মপ্রকাশের জন্য মহাজাগতিক শান্তিরও আমাকে দরকার। রবীন্দ্রনাথে তা এইভাবে উপলব্ধ হয় - তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নিচে .. ..। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, প্রকৃত পথ তাহলে একই, একটিই, - হরাইজন্টাল স্বনির্ভর কল্যাণ-পল্লী-প্রবাহ যেখানে কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়, সবাই নিজ নিজ বোধি ধর্ম সংঘে, এককথায় ব্যক্তিত্বে, বলিষ্ঠ। এটি পেতে হলে বাস্তবে আমাকে রুটি-কাপড়-মকানে স্বনির্ভর হতে হবে। গান্ধির জীবন ছিল এই বাণীরই বাস্তবতা। এবং এটি যে গান্ধির আবিষ্কার তা কখনই নয়, আবহমান কাল ধরে মানুষ এই ভাবেই বেঁচে এসেছে। গান্ধির কৃতিত্ব এইটেই যে, এই জীবনযাপনের মধ্যে যে অপরিসীম মহত্ত্ব প্রচ্ছন্নভাবে স্বপ্রকাশিত রয়েছে তাকে নিজের জীবন দিয়েই সর্বসমক্ষে পরিচিত করানো। যে করবে সেই পারবে, তর্ক তুললে তা কাজটি করতে করতেই তুলতে হবে।

৯

সাম্প্রতিকের একটি তথ্য দিলে তথ্য-রাজ ও শিল্প-রাজের ফারাকটা বোঝা যাবে। এটির উৎসও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একটি অটোমোবাইল তৈরি হতে চল্লিশ শতাংশ লাগে তথ্য, ধারণা ও কৌশল(ষাট শতাংশ শক্তি (জ্বালানি) এবং কাঁচা মাল। কম্পিউটার চিপস হতে আটানব্বই শতাংশ লাগে জ্ঞান-ধারণা ও কৌশল, এবং মাত্র দুই শতাংশ শক্তি ও কাঁচামাল। আবার এটাও জেনে নেয়া দরকার একটা পার্সোন্যাল কম্পিউটার হতে তিরিশ হাজার লিটার জল খরচ হয়, একটি পিসি'র পনেরো সেমি দীর্ঘ সিলিকন ওয়েফার তৈরি করতে লাগে নয় কিলোগ্রাম তরল রাসায়নিক দ্রব্য আর ছ'হাজার লিটার গ্যাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এসবের দায় ঢের বেশি। সুতরাং নিজেদের ধারণাকে পরিষ্কার করে নিতে হয় এই ভেবে যে, সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিবাদ নয় - তন্ত্র একটাই - তা হলো বাজারতন্ত্র, যেখানে পুঁজি-প্রযুক্তি-কাঁচামাল-মানুষ তার শ্রম ও জ্ঞান নিয়ে মজুদ। সেখানে বাজারকে যত দ্রুত এধার সেধার করা যাবে, মানুষের রিপুগুলোকে উসকে যত দ্রুত চাহিদা জাগিয়ে তা মেটানো যাবে - বাজারের সবলতা তত, সফলতাও তত ঘটবে। খুব ভালভাবেই এই বাজার-বিশেষজ্ঞরা জানেন, মানবরিপুর তমোময়তা যেমন জাগে তেমনই সরেও যায়। তাই দ্রুততার সঙ্গে বাণিজ্য, প্রয়োজনে ধ্বংস (যথা, আফগানিস্তান ইরাক নিয়ে মার্কিন নেতৃত্বে জি-আট দেশের লুটে খাওয়া, যার অংশীদার রাশিয়াও, তাই গর্জন শুনব, বিভ্রান্ত হবো না), প্রয়োজনে আত্মধ্বংস (যথা, জোড়া টাওয়ার ভাঙা) করে উদ্দেশ্য হাসিল করে নিতে হবে। আজকের যুগের অস্থিরতার এটিই কারণ। রিপুর ফোকাস সরে যাচ্ছে বলে পরিবারে হিংসা অশান্তি হত্যা(সম্প্রদায়ে হিংস্রতা জাতপাত-দাঙ্গা, স্বধর্মপালনের নামে পরধর্মাবলম্বীদের নিধন(রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বাজার দখল নিয়েই বৈরিতা, কখনও ঝগড়া কখনও মৈত্রী। বাগদাদ থেকে নন্দীগ্রাম - অঙ্কটা এই।

এর মধ্যে আর দুটি সংকট শিকড়কে নাড়া দিয়ে বসেছে। প্রযুক্তি প্রকৃতিতে দারুণ ক্ষত করে বসেছে। এই ক্ষতিটা এত মারাত্মক এত মারাত্মক যে গান্ধিপন্থা ছাড়া বাঁচার কোনই আশা নেই। পূর্বেই জানিয়েছি 'টাইম' পত্রিকার সারভাইভাল-সংকলনের কথা, সেখানে (টাইম-ওয়েবসাইটে তা পাওয়া যাচ্ছে) দেখা যাচ্ছে মার্কিন মানুষদের ভোগবিলাস কমাতে কতটা প্রচেষ্টা তাদের করতে হচ্ছে। এ এক দিক। অন্যদিক হলো, প্রযুক্তি যত ঢুকেছে মানুষ তত সরে গেছে। কর্মহীনের সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। এই কর্মহীনের পালকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজন পড়ছে মস্তানতন্ত্রের, তোলাবাজ পার্টির। যারা যত সাফল্যের সঙ্গে এই ক্ষুধার্ত পীড়িত জনতাকে বেড় দিয়ে রাখতে পারবে - রাষ্ট্র ও বণিকগোষ্ঠী তাদেরই পছন্দ করবে। কাজেই নন্দীগ্রামে চটি-পরা 'পুলিশ' স্পটার যে অপরেশনে নামবে এতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। এও ভোলার নয়, ২০০১ সালে গড়বেতায় ছোট-আঙরিয়া গ্রামে এক কুটিরে আগুন লাগে, ভেতরে জনা দশেক লোক ছিল, তারা নিখোঁজ হয়ে যায়, তারা মৃত এমন কথা আমরা বলতে পারি না কারণ তাদের দেহ পাওয়া যায় নি।

কিন্তু এইটুকুই ছিল যথেষ্ট। তার ফল পাই ২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে। ২০,০০০ আসনে বিরোধীপক্ষ বলে কেউ ছিলই না, নাম দিতেই ভরসা পায় নি তারা। সেই স্ট্রাটেজি মাথায় রেখেই নন্দীগ্রাম দখল শুরু হয়েছিল, এমনকি সেই সেই মস্তানদেরই কাজে লাগানো হয়েছিল বলে 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' সংবাদ দিয়েছিল। হয়ত একটু বেশি মানুষ 'উধাও' হয়ে গেছে, হয়ত মাটির প্রতি মানুষের কোন আধ্যাত্মিক দুর্বলতা কাজ করেছে, তাই উতরোনো যায় নি। মরিচঝাঁপিতে তো এর থেকে ঢের বেশি মানুষকে লোপাট করে দেয়া হয়েছিল - তাহলে কেন এমন হলো! মোলায়েমভাবে খুন করার পথ একদল নিশ্চয় বার করবে এবং ততোধিক নিশ্চিতির সঙ্গে এও বিশ্বাস রাখি একটি সুস্থ প্রতিস্পর্ধী পথও থেকে যাবে তা ঠেকাবার। .. .. ..

কৈশোর (২০০৯)

তথাকথিত পড়ার চাপ কোনও কথা নয়, এটা অভিভাবকের ভাবনার বিভ্রমই - কিশোরজীবনে এনে দিতে হবে অফুরান স্পেশ ও অগণন শৈল্পিক দৃষ্টান্ত। সেইসব থেকে একটা দুটো তুলে নেবে কিশোর মন, গড়ে উঠবে সুস্থ ও শুদ্ধ জীবন-মনন। চাইলেই তা পারা যায়। কিভাবে তা হচ্ছে তার কথা। একটি লেখা

কৈশোর

অম্লান দত্ত

মানুষ জীবটার সঙ্গে অন্য জীবের একটা বিশেষ তফাৎ রয়েছে এইখানে যে, মানুষ-জীবটার সৃষ্টিশক্তি রয়েছে যা অন্য জীবদের নেই। আর মানুষ যখন কৈশোরে তখন হলো বিস্ফোটের সময়। একটু একটু করে যা বিকশিত হচ্ছিল, একেবারে অকস্মাৎই তা ফেটে পড়ল এই বয়সে। একটু একটু করে বেড়ে চলাটি তত নজরে আসে না, কিন্তু হঠাৎই, সবেগে বিস্ফোরণ, চমকে দেয় আমাদের। কৈশোর সেই বয়স। দু দিক দিয়ে ঘটে বিস্ফোরণ। সে আত্মনির্ভর হতে চায়। সে সৃষ্টিশীল হতে চায়। প্রকৃতির নিয়মে যে শিশু প্রধানত মায়ের ওপর নির্ভর করে চলত, কৈশোরে সে বিদ্রোহ করে বসল, সে পরনির্ভর থাকবে না। হঠাৎই এই পৃথক মেজাজ আমাদের অভ্যস্ত জীবনের ছন্দে ঘা দিতে শুরু করে। তার দেহ ও মনে এই যে অকস্মাৎ উল্লম্ফন এটি তার কাছেই বেশ সংকটের — আমরা সে নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে দেখে নিই বড়রা কি চোখে এই 'হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা' মানুষটিকে দেখছেন। বড়রা বলছেন, ভারী অবাধ্য। অথচ একটু ভাবলেই টের পাওয়া যাবে যে, এটি আসলে বড় হওয়ারই লক্ষণ। প্রকৃতি মানুষ নামের জীবটিকে শৈশব থেকে অনেকটা সময় ধরে সইয়ে সইয়ে হঠাৎই তাকে বড় করে দিচ্ছে। বড়রা প্রকৃতির এই আকস্মিকতার ভাষাটি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই সম্ভবত এই বয়সের মানুষদের সঙ্গে যে ব্যবহার করলে মঙ্গল হয় তা করতে পারেন না। অথচ বাচ্চার বেলায় বড়রা সে ঝুঁকি নেন। ধরা যাক, বাচ্চা হাঁটছে। সে হাঁটবে, হাঁটতে সে চাইবে, এবং হাঁটতে যদি সে না পারে কি না চায় তাহলে তা উদ্বেগের ব্যাপার হয়ে উঠবে। তাই বাচ্চার হাঁটতে চাওয়ার সঙ্গে বাবা-মা সদর্থে এমন ভাবনাগুলো করে নেন যে, বাচ্চা হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে, কাজেই তাকে সেই নিরাপত্তা দিতে হবে এবং তাকে হাঁটতে উৎসাহ দিতে হবে। তাদের এই ধরনের ভাবনাটি কিশোরের বেলায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। হতে পারে, কিশোর তার আবেগের আতিশয্যে বেশিমাত্রায় ঝুঁকি নিয়ে ফেলতে পারে। সেটা তার বয়সের ধর্ম। সেটা ধরে নিয়েই তাকে সেভাবেই সাবধানতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি বড়দের করা উচিত, কিন্তু সমস্যা এই যে, সেটি বড়রা করেন না। শিশুর বেলায় তারা যে ঝুঁকি নেন কিশোরের ক্ষেত্রে তারা তা নিতে সাহস করেন না। হয়ত এটা তাদের ভয় যে এতে কিশোরটি তাদের নাগাল ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু এটা তো ভেবে দেখাই যেতে পারে, বেশি আগলে রাখা, বিশেষত সেই বয়সে, যখন তার মনে উঠেছে আগল ভাঙার আহ্বান — তাকে বড় করতে পারবে না।

দৃষ্টান্তটা যদি নিজের দিকে তাকিয়ে করি তাহলে বলব আমি খুবই সৌভাগ্যবান ছিলাম। আমার মা ও বাবা পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন আমাকে। আমি কি করব না-করব সে ব্যাপারে তাঁরা সামান্যতম নির্দেশ দিতেন না। আমার বয়স যখন ষোলো, আমি কলকাতায় চলে এলাম, একা, মা বাবাকে ছেড়ে। বাবার বন্ধুরা কতভাবে যে নিষেধ করলেন, কিন্তু বাবা সেসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না, আমাকে কলকাতায় আসতে অনুমতি দিলেন। বাবা-মা'র যদি উদ্বেগ কিছু থেকেও থাকত তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। আবার তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই তাঁরা আমাকে ভালবাসতেন না সেটি যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারতাম ভালবাসার অন্য অন্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে। নিঃশব্দ সেবা এত আন্তরিকতার সঙ্গে ঘটত, যেমন, বিশেষ কোনো একটা খাবার, মা, বাড়ি গেলে, আমার জন্যে রাঁধতেন যা আমি খেতে ভালবাসতাম। এমনই ছোট ছোট বহু আন্তরিক মুহূর্ত তৈরি হতো যা দিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁরা আমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু ভালবাসার বাঁধন দিয়ে তার সশব্দ নিয়ন্ত্রণ করতেন না। এমন মজার ঘটনাও ঘটেছে, ছুটিছাটাতে দেশে গিয়েছি, কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতা ফিরছি, সঙ্গে সমবয়সী বন্ধু ফিরছে, তার বাবা তাকে বিদায় জানাতে এসেছেন, আমাকে বলছেন — 'ওকে একটু দেখো'! যাকে 'দেখতে' বলা হচ্ছে সে আর আমি একই বয়সী! হয়ত একারণেই রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় — সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করো নি! আমার বাবা-মা তা না করে আমাকে যথেষ্ট এগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর, তারও দু বছর পর, তাঁরা সকলে কলকাতায় চলে এলেন। এসময় দেখেছি ভালবাসার আরেক দিক। আমি বাড়ি ফিরলে — স্বাগত(আমি বাড়ি থেকে চলে গেলে কখনও কোনও প্রশ্ন তাঁরা করতেন না যে, কেন আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এই যাওয়া-আসার ঘটনা দিয়েই বহু পরিবারের জটিল টানাপোড়েন চোখে ধরা পড়ে যায় না কি?

সুতরাং বাবা-মা আর সন্তানের প্রসঙ্গ এলে বলব, তার বড় হবার যে ঐকান্তিক ইচ্ছাটি জেগেছে তাতে ঝুঁকি যদি থাকে তো সেটি এড়িয়ে যাওয়া নয়, তাকে গ্রহণ করে সন্তানকে এগিয়ে দেবার আয়োজন করতে হবে। আর ভালবাসা এমনই থাকতে হবে যে সে মানলে স্বাগত, না মানলেও গ্রাহ্য ।

২

এই সময়ের সংকটে যোগ হয় আরেক মাত্রা — সমাজ। কিশোর ভালবাসছে আঁকতে কি গান করতে, বাবা-মা তাকে চাপ দিচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, কারণ বাজারে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিটাই রাখা আছে আর তার টাকাপয়সা বেশ আকাশ-ছোঁয়া। দ্বন্দ্বের এই হলো আরেক দিক যা আজ প্রায় ঘরে ঘরে। সমাজ বলি কি পড়শি বলি, তার কাছে এখনকার চলতি ভালো থাকার সংজ্ঞা হলো ভালো চাকরি করা। সংকট সেক্ষেত্রে কিরকম ঘুরে যাচ্ছে, দেখা যাক। যে বয়সটা হতে চাইছে আত্মনির্ভর, হতে চাইছে সৃষ্টিশীল, তাকে বাধ্য করা হচ্ছে বাজার যে সুযোগটা রেখেছে সেই সুযোগের মধ্যে বাঁধা থাকতে। এই বয়সের এটিই মূল দ্বন্দ্ব, এবার। সে, কিশোর, কি করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদাটাই জেতে, তার স্রষ্টা হওয়াটা লোপ পেয়ে যায়। ফলে সমাজ একজন ইঞ্জিনিয়ার পাচ্ছে ঠিকই, একই সঙ্গে একটি মানুষকে হারাচ্ছে, বৈচিত্রের একটা পাপড়ি খসে যাচ্ছে। অথচ তাকালেই দেখব, প্রকৃতি তা চায় না। তার রাজ্যে বিচিত্রতার ছড়াছড়ি ও গলাগলি। মানুষের রাজ্যে যদি ভালো চাকরি ভালো মাইনে ভালো গাড়ি ইত্যাদিই একমাত্র হয় — তাহলে কি নিদারুণই না হয় বাঁচা। আর ওভাবে বাঁচা যায় না, প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে যখন মানুষের আবেগের স্ফূরণ হ্রাস করে — তখন তৈরি হয় আরেক সংকট। নেশা, বিকার তখন হয়ে পড়ে বাঁচার সঙ্গী। এইসবেরই উত্তর বা পথ কিন্তু কৈশোর থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

৩

ক্রিয়েটিভ ইমপালস বা সৃষ্টিশীল হবার যে প্রবণতা — তার অন্যতম সহজ ও সর্বজনীন প্রকাশ হলো ভালবাসা এবং যৌনতা। দুশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এই দুই আকাঙক্ষা সম্বন্ধে একটু বুঝবার চেষ্টা করা ভালো। প্রকৃতি এই দুই আকাঙক্ষা সর্বজনের জন্যে খোলা রেখেছে, একেবারে ধরাছোঁয়ার মধ্যে রেখে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা এও যে এই দুয়ের মর্মার্থ বুঝবার লোকের বড়ই অভাব। আমি যৌনকর্মীদের গড়া সংগঠনের দ্বারা বহুবারই আমন্ত্রিত হয়েছি, নানা সম্মান তারা আমাকে দিয়েছেন, যৌনতা নিয়ে সেখানে আমাকে কিছু বলতে হয়েছে, আবার অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির ভাষণও শুনতে হয়েছে। তো, অধিকাংশ পণ্ডিত ঐ বিষয়ে যা যা বলেছেন তা শুনে আমি ভীত — এত অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞান মস্তিষ্কে রেখে, কখনও বা হৃদয়ে বহন করে যৌনশিক্ষা দেয়ার চেয়ে না দেয়াই সমাজের পক্ষে বোধকরি ভালো।

প্রথমত জানা দরকার শারীরবিদ্যার দিক দিয়ে যৌনতা যৌন-ইচ্ছা ইত্যাদি। এটা ফিজিওলজিক্যাল দিক। শরীরের গঠন, হরমোনের প্রভাব, বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি জানিয়েছে — এইসব দিয়ে শুরু করে রিদম মেথড কি, কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার ইত্যাদি হলো এই শিক্ষার অঙ্গ। আমি মনে করি যে কোনো চিকিৎসকই এই শিক্ষাটি দেবার উপযুক্ত। এসব শিখলে একধরনের সাবধানতা নেয়া যেতে পারে। একটা সতর্কতা এখানে শেখানো যেতে পারে যে, যে কেউই এই পথে পা বাড়াক না কেন, কতটা যেতে হবে ও কতটা পরে ফেরৎ আসা সম্ভব নয় — এইগুলো বুঝতে শেখা এই শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু এখানেই তা শেষ নয়। এর পরের ধাপের যে শিক্ষা, যাকে বলব মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা, সেটি দিতে হলে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে ভালবাসা কি, যৌনতা কি, এবং তত্ত্বগতভাবে যা শিখেছি আমার মন কি তাতে সায় দিয়েছে, আমি কি অনুভবেও তাই জেনেছি? না যদি তা হয় তাহলে এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে আমি অক্ষম। সেগুলো এবার বুঝে নেয়া যাক।

৪

প্রথম কথা হলো যৌনতা যদি ভালো হয়, শুভ-আকাঙক্ষা হয়, তাহলে আবার আমরা ব্রহ্মচর্যের কথা বলি কেন? ব্রহ্মচর্য যদি ভালো হয় তাহলে যৌনতার উপযোগ থাকে কি করে?

ব্রহ্মচর্য যদি ভালো হয় এবং সব মানুষ যদি তা পালন করেন তাহলে এটি বুঝতে বিশেষ একটা অসুবিধে হয় না যে, এক প্রজন্মেই মানুষ নামের জীবটার অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে! প্রকৃতি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁর সেরকম কোনও অভিপ্রায় নেই। তাহলে আমরা ব্রহ্মচর্যের নিশ্চয় কোনও ভুল অর্থ করে ফেলেছি। কি সেটি? তাহলে কি আমরা মনে মনে বুঝে নিয়েছি যে ব্রহ্মচর্যের কথাটা মুখে বলব কিন্তু মানুষ যৌনতার আওতা থেকে বার হতে পারবে না, অতএব তা নির্ভয়ে বলা যায়? বিজ্ঞানের কোনো প্রসঙ্গে কি এরকম ভাবনা নিয়ে আমরা কথা বলি? ধরা যাক, নিউটনের সূত্র বললাম, এবং নিশ্চিতভাবে এও জানা আছে যে তা দিয়ে কোনও কাজের কাজ হবে না — এরকম কি হয়? হয় না। অথচ ব্রহ্মচর্যের বেলা তাই যেন হয়ে যাচ্ছে। আর ব্রহ্মচর্যের প্রতি অবিশ্বাস এবং বোধহীনতার কারণ এই যে আমাদের মন কলুষিত হয়ে আছে যৌনতা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণায় — মনের গভীরে গেঁথে গেছে যে যৌনতা একটা পাপ প্রবৃত্তি। একেবারে সাদামাটা কথা — যৌনতা একটা পাপ। এই মন নিয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শিক্ষা দেয়া যায় না। প্রথমে পরিষ্কার হয়ে নিই যে, যে মানুষ যৌনতার-ঊর্ধ্বে যদি ব্রহ্মচর্যের কথা ভাবেন কি পালন করেন তা তিনি যদি ঐ পাপ-বোধ মুক্ত হয়ে করতে পারেন তাহলে ক্ষতি নেই, তাতে বিপদের কারণও নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যদি যৌনতা একটা পাপ কাজ এমনটা ভেবে তা নিয়ন্ত্রণ করাটাই ব্রহ্মচর্য বলে মনে করেন তাহলে তা ক্ষতিকর। তাই অন্য কোনও সমন্বয়ের কথা চিন্তা করে দেখতে হবে।

যৌনতা একটা গোপন ও পাপকর্ম — এই পাপবোধ মনের এতই গভীরে বাসা বেঁধে রয়েছে যার ফলে ব্রহ্মচর্যের ইহার্থও আমাদের জ্ঞানের বাইরে রয়ে গেছে, বাইরে রয়ে গেছে অফুরন্ত ভালবাসার প্রাকৃতিক দানটিও। আমরা জেনে নিয়েছি — যৌনতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলা চলে না। তার পরিণাম হলো — প্রায় সর্বত্রই দৃশ্য, হতাশা ও নির্দয় স্বভাব যা কিনা আত্মহননেরই আরেক রূপ। নিজেকে নির্দয়ভাবে অত্যাচার করার পরিবর্তে অন্যকে পিষ্ট করার বাসনা।

তাহলে ব্রহ্মচর্য কি? শব্দটাতেই রয়েছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত — ব্রহ্মের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, সত্যের জন্য নিজেকে তৈরি করা। যৌনতা ও ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গে গান্ধির উদাহরণ তোলা হয়, বোধকরি সেখানেও কিছু ভুল ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। কৈশোরে যে আচরণের জন্যে তাঁর পাপবোধ জেগেছিল, সেইটি ধরে কিন্তু তিনি মধ্যবয়সে যৌনতায় বিধিনিষেধ আরোপ করেন নি। তিনি একটি অতি সহজ যুক্তি দিয়েছিলেন — একজন সামাজিক

মানুষের দরজা থাকবে খোলা, কারণ রাতবিরেতে তার কাছে লোক আসতে পারে। ফলত তিনি শোবার ঘরে দরজাই রাখেন নি। আর দরজা যদি খোলা রাখতে হয় তাহলে সঙ্গমকর্ম চলতে পারে না। তাহলে বন্ধ করে দিতে হয় যৌনকর্ম। এর সঙ্গে, অর্থাৎ যৌন-ইচ্ছা থেকে মুক্ত হবার পর, তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। সেইটি তাঁর একান্ত নিজস্ব ধারণা — এটাই যে একমাত্র পথ বা যুক্তি তা বোধকরি নয়, এমন অনেক উচ্চমার্গের মানুষের দৃষ্টান্তও আমরা জানি যাঁরা যৌনকর্মে অবিশ্বাসী নন অথচ সত্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতে কোন বাধা তাঁরা পান নি। রবীন্দ্রনাথ রাসেল আইনস্টাইন — দৃষ্টান্ত বড় কম নয়।

ব্রহ্মচর্যের আচরণে, ধরে নেয়া হয়, মানুষ, প্রকৃতিগত অভিপ্রায়ে যে যৌনবন্ধনে আটকে থাকতে চায় — সেখান থেকে মুক্তির জন্য তথা ব্রহ্মের আনন্দে মগ্ন হবার জন্য তাকে যৌনতায় রাশ টানতে হবে। নাহলে সে স্থূল জৈবিক কামনাতে বদ্ধ থেকে যাবে। এর সঙ্গে এও ভেবে নেয়া হয়েছিল বা এও হয়ত তাঁদের, সেই অতীত কালের ঋষিদের অনুভবে এসেছিল যে, যৌনতা এমন এক বন্ধন যা ভালবাসা দিয়ে শুরু হয়, যা বাহ্য দৃশ্য ঘটনাবলী দিয়ে শরীরকে এতটাই উসকে দেয় যাতে তৈরি হয় হিংসা অবিশ্বাস বিদ্বেষ, সেখানে যৌনতা একটি সংঘাত হয়ে উঠছে। এই এতটা অবিশ্বাস তো সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারে না তাই যৌনতায় রাশ টানা দরকার। এমন একটা ভাবনাও হয়ত কাজ করেছিল। অনেক পরে এই অবিশ্বাসের জায়গাটা দখল করবে টাকা। হিংসা অবিশ্বাস আর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে টাকা।

ফলে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে এমন একটা জ্ঞান আমাদের আয়ত্তে এসেছে যা আমরা বিশ্বাস করি না এবং নিজ নিজ জীবনে যৌনতা সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা জন্মেছে যে যা আদৌ বিশ্বাসব্যঞ্জক নয় — মনের গভীরে রয়ে আছে যে অন্ধকার তা দিয়ে এত বড় বিষয়টির সদর্থ কি শিক্ষক দিতে পারেন? তাঁর মনে যখন দৃঢ় সন্দেহই জন্মেছে যে যৌনতা একটি পাপাচার?

৫

সুতরাং কৈশোর নিয়ে যখন ভাবব, তার সৃষ্টিশীলতার আবেগ ও বিস্ফোরণ নিয়ে যখন ভাবব, তখন স্বাভাবিকভাবেই যৌনতা প্রসঙ্গটি চলে আসবে, আর তাতে ইহভাব যোগ দিতে হলে আমাদের সকলকেই ধারণাটা যেমন স্পষ্ট করে নিতে হবে, তেমনই মনের মধ্যেও পরিষ্কার থাকতে হবে। প্রথমেই পরিষ্কার হতে হবে এই ধারণায় যে, যৌনতা মোটেও পাপ নয়। মজাটা এবার দেখা যাক। একটি আলোচনাচক্রে একজন মহিলা-অধ্যাপক এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন আমার স্বামী আমার কাছ থেকে যা জানতে চান তা হলো, আমি অন্য কারোকে ভালবাসি না তো! কি অদ্ভুত এবং কি বাস্তব একটা সংলাপ ধরিয়ে দিচ্ছে মনের গভীরে বসে থাকা সংকটকে — স্বামী প্রশ্ন করছে না সে তার স্ত্রীকে ভালবাসে কি না, সে এ প্রশ্নও করছে না যে তাকে তার স্ত্রী ভালবাসে কিনা, সে জানতে চাইছে তার স্ত্রী অন্য কোনও পুরুষকে ভালবাসে কিনা! এই সন্দেহাত্মক মন নিয়ে সে যৌনকর্মে নামবে, নামবে তার কর্তৃত্ব অধিকার নির্দয়তা পরখ করতে, এবং সে ভালবাসার মূল অর্থ হারিয়ে ভালবাসার নামে বশ্যতা খুঁজবে, পদে পদে নিপীড়িত হবে ও নির্যাতন করবে।

ফিরে বলি, প্রকৃতি সবাইকে গান দেন নি, আঁকবার দক্ষতা দেন নি, বিজ্ঞানের দরজা খুলে দেন নি, অনেককিছুই দেন নি, কিন্তু এমন সুন্দর দুটি জিনিস সবার হাতে তুলে দিয়েছেন যা সত্যিই অভাবনীয়। দিয়েছেন ভালবাসা, দিয়েছেন যৌনতা। দিয়েছেন তা আলোর মত, অতি সহজ, অতি নিবিড়। সে আলোর দুটো ধরন। এক, সে আলো ছড়িয়ে পড়বে, গোপন থাকবে না। দুই, সে আলো সংহত হয়ে তাপে পরিণত হবে। দুটোই, প্রকৃতি, একেবারে সব মানুষের নাগালের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। গরীব বড়লোক, উঁচু জাত নিচু জাত, সাদা কালো ভেদ করেন নি। দরকার দুটোই তবে শর্তটা একেবারে গোড়াতেই রয়েছে। আলোকে আলোর মতই উদ্ভাসিত থাকতে হবে, ভালবাসা থাকতে হবে, শুভেচ্ছা সহমর্মিতা থাকতে হবে। নাহলে শুধু তাপে মত্ত হয়ে পুড়ে মরতে হবে। যেহেতু আলোর মতই তার সহজ স্বাভাবিক সাবলীল ও অবারিত গতি তাই পালাবার পথ নেই — আবার পুড়ে মরতেই বা কে চায়? তত্ত্বত এটি বুঝে ওঠা খুব কিছু কঠিন নয়, খুবই সহজ, কিন্তু কঠিন হলো তাকে নিজের জীবনে নিয়ে আসা, এই সুরে নিজেকে মুক্ত করা, আলগা করা। এটাই কঠিন। এটাই বাস্তব।

এই পর্বে আসবে অনাসক্তির প্রসঙ্গ। উদাসীনতা নয়, আসক্তি নয়, দাবি তো নয়ই — ভালবাসা নামের আলোটিকে আসক্তি ইত্যাদির মোহ থেকে বার করে এনে দেখতে থাকা। দেখা, স্রেফ দেখাটাই অনেককিছু সমস্যার সমাধান করে দেবে। স্ত্রী অন্য কারোকে ভালবাসে কি না এই ভাবনায় ভাবিত না হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসাটি, শুভেচ্ছার সম্বন্ধটি অটুট রয়েছে কি না তা দেখা। এটাই অনাসক্তি। কি কিশোর কি তরুণ সকলেই তা করে দেখতে পারে। যদি বলা হয় এটা অভ্যাসের ব্যাপার তাহলে তাইই বলব। এটা পরীক্ষা করেই দেখতে হবে। পরীক্ষাটিও কিন্তু সহজ।

৬

একে এভাবেও বলা যায় যে, মনকে তৈরি করার ব্যায়াম। যার পথগুলি হবে — এক, নিজের মনের দিকে তাকানো, নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা, কি করছি আমি স্রেফ সেটাই দেখতে শুরু করা, তারপরে আসবে ভাবা। দুই, এই দেখাটি যেন নির্দয়ভাবাপন্ন না হয়, না নিজের প্রতি, না অন্যের প্রতি। তিন, সতর্ক থাকি কিন্তু, একই সঙ্গে, স্নেহশীলও থাকি — নিজের আচরণের প্রতি, অন্যের প্রতিও। চার, ভুল নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা, ভুল করেছি মানে আর রেহাই নেই এই পাপবোধ থেকে মুক্ত থাকা। আবার, ভুল করেছি, ফের ভুল করব — এমন ধারণাও পরিহার করা। মনে রাখতে হবে, মানুষ ভুল করে, মানুষ তা সংশোধনও করে, এই পথ ধরে যেতে যেতেই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। মনকে এভাবেই তৈরি করতে হবে। এটি সব মানুষের হাতেকলমে করার বিষয়, করে বোঝার বিষয় — কৈশোর এই পরীক্ষার ব্যতিক্রম নয়।

ব্যতিক্রম যে নয় এই বয়সের মানুষেরা তাও সহজে বোঝা যায়। প্রশ্নটা যৌনতা দিয়েই যখন শুরু হয়েছে তখন তা দিয়ে বোঝা যেতে পারে। একটি কিশোর আরেক কিশোরীর প্রতি ভালবাসায় আবদ্ধ হয়েছে। যদি সদিচ্ছা এই শব্দটা প্রয়োগ করি তাহলে এইই পাই যে এই বিশেষ ইচ্ছা একটা অ্যাক্টিভিটির প্রসঙ্গ, আইডিয়ার ততটা নয়। তো, সদিচ্ছা কি নিয়ে হবে? সেটা মোটেও অ্যাবস্ট্রাক্ট নয় — সহজেই তা বাস্তব বোঝাপড়া থেকেই বুঝে নেয়া যায়। আমি ভালবাসছি, মানে আমি আমার যেমন, তেমনই আমার বন্ধুটিরও কল্যাণ চাইছি — তাহলে এমন কোনো আচরণ যদি করে বসি,

যাতে দুজনের ক্ষতি, কি, আমার তৃপ্তি হলেও, আমার ভালবাসার জনের ক্ষতি, তাহলে তা করা সঙ্গত হবে না। তত্ত্বত এইটি বুঝে নেয়া কঠিন নয় যদি নিজের প্রতি পর্যবেক্ষণের অভ্যাস থাকে। কঠিন তা মানা। এমন অবস্থায় পড়েছেন এবং মেনেছেন এমন দৃষ্টান্তও কিন্তু আমাদের জানা অছে। আমি মনে করি, নিজের এবং অপরের প্রতি দরদ নিয়ে দেখার অভ্যাস থাকলে এমন পরিবেশে আলোই আনা যায়(অন্ধকারে, তাপে পুড়ে মরার চেয়ে।

৭

অবশেষে আরেকটি প্রসঙ্গ পড়ে থাকে। প্রথমেই বলা হয়েছিল কৈশোর হলো বিদ্রোহের বয়স। কিসের জন্য কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ? সহজ উত্তর — সাম্যের জন্য অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিশোর বয়সই এই পরীক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট সময়। কারণ সে চাইছে বড় হতে — বড় হবার সে পথে সাম্যের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াটা জরুরি।

জরুরি, কারণ এর পরই কিশোরটি বিপ্লবী হয়ে উঠবে, ল্যাটিন আমেরিকা চিন রাশিয়া ইত্যাদি দেশের বিপ্লব - নেতৃত্ব - পার্টির ভূমিকা নিয়ে রাত জেগে পুঁথিপত্র পড়বে — কিন্তু যে পরিচারক অথবা পরিচারিকাটি তার বাড়িতে কাজ করতে এসেছেন তার সঙ্গে একাসনে খাওয়া, তার সঙ্গে সুখদুঃখের গল্প করা যে বিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত এবং সাম্য স্থাপনের এইই যে প্রকৃষ্ট পথ এটা তো সে শিখছে না অথচ সামান্য চেষ্টা করলেই তা শিখে নেয়া সম্ভব। সাম্য নিজের ঘর থেকে তৈরি করতে হবে। ধরে নিচ্ছি, যিনি আমার বাড়িতে কাজ করতে এসেছেন এই কাজ ছাড়া তাঁর উপার্জনের আর কোনও পথ এখনও খোলা নেই — তাহলে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি হবে? আমি প্রভু তিনি ভৃত্য — মোটেও নয়। তাহলে আমাদের মধ্যে বন্ধুর সম্পর্ক তৈরি করার দিকে আমাকে নজর দিতে হবে — বিপ্লবী অনেক বাড়ি দেখেছি কিন্তু এমন বাড়ি এমন বিপ্লবীদের মধ্যে বেশি দেখি নি যেখানে এক আসনে 'কাজের লোক' আর 'বাড়ির মালিক' বসে খাচ্ছে।

বড় হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত তো এও যে, সমাজে সাম্য থাকবে, সবাই সবার প্রতি শুভবোধটি ন্যস্ত করতে শিখবে। এও ঘর থেকে শেখার বিষয়। কিশোর এই পরীক্ষাটি বড় মমতার সঙ্গেই করতে পারে — এই বিশ্বাসটি ধরে রাখতে ক্ষতি নেই।

(কথোকপকথনভিত্তিক এই প্রবন্ধটির লেখ্যরূপ দিয়েছেন পথিক বসু)।

শ্র য় ণ

দুই বাংলার অন্যতম সংগঠন যারা আত্মশ্রদ্ধা, প্রকৃতি-সুরক্ষণ ও সমাজ-হিতসাধন নিয়ে প্রকাশ করে চলেছে অনবদ্য কিছু গ্রন্থ এবং, একই সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করে চলেছে গ্রাম ও শহরে।

শ্রয়ণগ্রন্থ শুধু পড়ার জন্য নয়, নিজেকে কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও। বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, এন-জি-ও শ্রয়ণের পরীক্ষিত পথ ধরে নিজেদের মত করে পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। কাজ করে চলেছেন ব্যক্তিজনেরাও, আপন আপন লক্ষ্যে।

শ্রয়ণ-গ্রন্থমালায় আই আই টি, আই আই এম, প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রমুখে স্বাক্ষরজনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে অংশ নেন স্বশিক্ষিত শ্রমিক-কৃষক বন্ধুরা। ফলে একই গ্রন্থে আপনি দেখতেই পারেন কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে মত বিনিময় করছেন পাতাকুড়োনী একটি জিজ্ঞাসু কন্যা - একমাত্র শ্রয়ণই এভাবে সমস্ত স্তরের মানুষকে চিন্তার আন্দোলনে কাছে নিয়ে আসতে পেরেছে। চিন্তা থেকে কর্ম - বিরাট ব্যাপৃতি ঘটেছে শ্রয়ণে। প্রশস্তি নয়, আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি - শ্র য় ণ। আভিধানিক অর্থ - আ শ্র য়।

গ্র ন্থ প্রা প্তি স্থা ন

প শ্চি ম ব ঙ্গে

দে'জ পাবলিশিং (কলেজ স্ট্রিট / কলকাতা)
দে বুক স্টোরস্ (কলেজ স্ট্রিট / কলকাতা)
এবং মুশায়েরা (বিদ্যাসাগর টাওয়ার / কলেজ স্ট্রিট)
প্রগ্রেসিভ (কল্যাণ ঘোষ/ রাসবিহারী এভিন্যু ক্রসিং)
বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলায় / কলেজ স্ট্রিট)

বুকস্ (শিলিগুড়ি)

বাংলাদেশে

নবযুগ প্রকাশনী (ঢাকা / বাংলাদেশ)

একুশে (ঢাকা / বাংলাদেশ)

শ্রয়ণ

(সম্পাদক - পথিক বসু)

২বি প্রতিরূপা

৪৯বি সন্তোষপুর ইস্ট রোড

কলকাতা ৭০০ ০৭৫

দূরভাষ ২৪১৬ ২১০২

ই-ঠিকানা - shrayan1@gmail.com / parthapathik@gmail.com